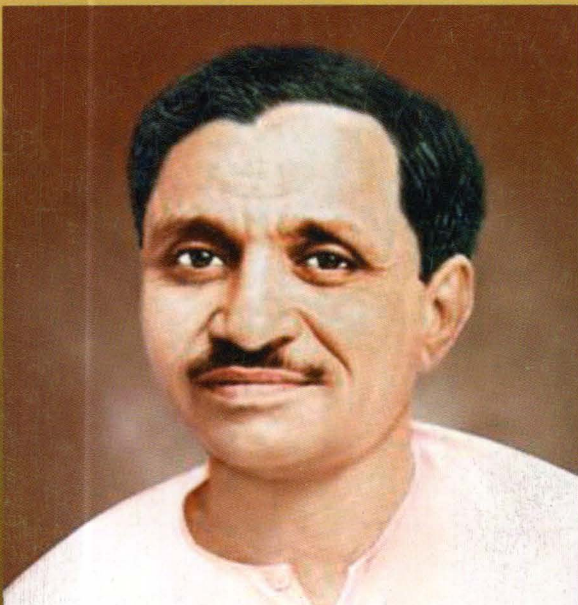
# একাত্ম মানব দর্শন



পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়

তুহিনা
প্রকাশনী

# একাত্ম মানবদর্শন

পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়

তুহিনা প্রকাশনী
৩০/৬/২এ, মদন মিত্র লেন
কলকাতা-৭০০০০৬

মুদ্রক
মহামায়া প্রেস এন্ড বাইন্ডিং, ২৩, মদন মিত্র লেন, কলকাতা-৭০০০০৬
প্রাপ্তিস্থান
তুহিনা প্রকাশনী, ১২সি, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০৭৩
মূল্য ঃ ২০.০০ টাকা

# ভূমিকা

পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় ভারতীয় জনসঙ্ঘের সভাপতি ছিলেন। বর্তমানের ভারতীয় জনতা পার্টি আগে ভারতীয় জনসঙ্ঘ নামে পরিচিত ছিল।

১৯৬৫ সালে গোয়ালিয়রে ভারতীয় জনসঙ্ঘের প্রতিনিধি সভার অধিবেশনে দীনদয়ালজী একাত্ম মানবদর্শন আলোচনার জন্য উত্থাপন করেছিলেন এবং বিস্তারিত আলোচনার পর ওই বছরেই বেজওয়াদায় দলের সর্বভারতীয় সম্মেলনে তা গৃহীত হয়।

দীনদয়ালজী দেশের বিভিন্ন প্রান্তে অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণ শিবিরগুলোতে দলীয় কর্মীদের 'একাত্ম মানবদর্শন' ব্যাখ্যা করেছিলেন। গত শতাব্দীর ষাটের দশকের শেষে তিনি কলকাতায় তিনদিনের এক শিবিরে পশ্চিমবঙ্গ, বিহার ও অসমের দলীয় নেতাদের কাছে 'একাত্ম মানবদর্শন'-এর বিষয়টা তুলে ধরেন। তিনি ঐসব বক্তৃতা হিন্দীতে করেছিলেন। পরবর্তীকালে Integral Humanism নাম দিয়ে ইংরাজিতে বই আকারে দলের পক্ষ থেকে তা প্রকাশ করা হয়। দলের বিশিষ্ট নেতা প্রয়াত হরিপ্রসন্ন মিশ্র এটি বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেছিলেন এবং ১৯৭৫ সালে এটি বাংলা ভাষায় প্রথম বই আকারে প্রকাশিত হয়।

বি. জে. পি.-র রাজনৈতিক দর্শনের মূল ভিত্তি হল একাত্ম মানবদর্শন। আজকের সমস্যা জর্জরিত অশান্ত এই পৃথিবীতে মানুষ যখন 'সভ্যতার সংকট'-এর মুখোমুখি; আদর্শ, নৈতিকতা তথা মূল্যবোধগুলো যখন হারিয়ে যেতে বসেছে, তখন 'একাত্ম মানবদর্শন'-ই হতে পারে একমাত্র আলোকবর্তিতা—মানুষের মুক্তির পথ।

সারা বিশ্ব কমিউনিজমকে প্রত্যাখ্যান করার ফলে এদেশের কমিউনিষ্ট দলগুলোর হাঁসজারু অবস্থা, সমাজবাদীদের 'বৈপ্লবিক স্বপ্ন' দেখার দিন শেষ, কংগ্রেসের দেউলিয়াপনার পরিপ্রেক্ষিতে ভারতীয় জনতা পার্টির নীতিনিষ্ঠ রাজনীতিই একমাত্র পথ—যা একাত্ম মানববাদের শক্ত ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে সঠিক দিশায় দেশকে শক্তিশালী করতে বদ্ধপরিকর।

ভারতীয় জনতা পার্টির প্রতি মানুষের আগ্রহ যত বাড়ছে, এই বইয়ের চাহিদাও তত বাড়ছে। সেই চাহিদা মেটাতেই এটি পুনর্মুদ্রণ করা হল।

ভারতমাতা কী জয়। বন্দে মাতরম্।

অধ্যাপক তথাগত রায়

## চতুর্থ সংস্করণের ভূমিকা

একাত্ম মানবদর্শন ভারতীয় জনতা পার্টির মূল দর্শন। তৃতীয় সংস্করণে এমন কিছু মারাত্মক প্রমাদ ছিল, যার ফলে বাক্যের অর্থ পালটে যাচ্ছিল। এই সংস্করণে সেগুলি শুদ্ধ করে দেওয়া হলো। আজকের রাজনীতিতে একাত্ম মানববাদ প্রত্যেকটি মানুষের কাছে কত প্রয়োজনীয়, সেটুকু সবাই উপলব্ধি করলে; পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ের প্রতি আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণাম জানানো সম্ভব হবে।

মহালয়া, ২০১৪

অসীম সরকার

# ভারত কোন পথে?

যতদিন ভারতবর্ষ ব্রিটিশ শাসনাধীন ছিল ততদিন সমস্ত আন্দোলন ও রাজনীতির মূল লক্ষ্য ছিল 'বৈদেশিক শাসনের অবসান এবং স্বাধীনতা অর্জন।' কিন্তু নূতন ভারতবর্ষের রূপ কি হইবে এবং কোন পথে আমরা অগ্রসর হইব এই সকল প্রশ্ন তখন পূর্ণরূপে বিবেচিত হয় না। কিন্তু সেই সময়েও এমন লোক ছিলেন যাঁহারা এই প্রশ্ন বিবেচনা করিয়াছিলেন। গান্ধীজী তাঁহার 'হিন্দী স্বরাজ' পুস্তকে স্বাধীন ভারত সম্পর্কে তাঁহার ধারণা ব্যক্ত করিয়াছিলেন। ইহার পূর্বে লোকমান্য তিলক তাঁহার 'গীতারহস্য' পুস্তকে ভারতের পুনরুত্থানের দার্শনিক পটভূমিকা আলোচনা করেন। ইহাতে সমগ্র পৃথিবীর তদানীন্তন বিভিন্ন মতবাদের তুলনামূলক আলোচনাও করা হইয়াছিল।

এতদ্ব্যতীত কংগ্রেস ও অন্যান্য রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রস্তাবের মাধ্যমে এই সকল বিষয়ের আলোচনা করেন। কিন্তু সেই সময় যতটুকু চিন্তা করা হইয়াছিল তদপেক্ষা অনেক বেশি চিন্তা ও বিশ্লেষণের প্রয়োজন রহিয়াছে। তখন এই সকল বিষয়ে লোকের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষিত হয় নাই, কারণ প্রত্যেকেই বিশ্বাস করিতেন যে ব্রিটিশ শাসনের অবসানের উপায় নির্ধারণ মুখ্য উদ্দেশ্য; অন্যান্য বিষয় পরে নির্ধারিত হইতে পারিবে। শুধুমাত্র অভ্যন্তরীণ বিষয়ের আলোচনায় কালক্ষেপ করা সেদিন উপযুক্ত বিবেচিত হইত না। সুতরাং আদর্শের পার্থক্য যদি থাকিয়াও থাকে তবে তাহা সাময়িক ভাবে এড়াইয়া যাওয়া হইত।

ফলস্বরূপ যাঁহারা মনে করিতেন যে সমাজতন্ত্রই ভবিষ্যৎ ভারতের ভিত্তি হওয়া প্রয়োজন তাঁহারাও কংগ্রেসের মধ্যেই সমাজতান্ত্রিক গোষ্ঠীরূপে কাজ করিয়াছিলেন, কোনও স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান গঠনের চেষ্টা করেন নাই। বিপ্লবীরাও তাঁহাদের নিজস্ব পন্থায় স্বাধীনতা অর্জনের চেষ্টা করিতে ছিলেন। সকলেরই এক বিষয়ে একমত ছিলেন যে প্রথম কার্য ভারতের স্বাধীনতা অর্জন।

স্বাধীনতা লাভের পর স্বভাবতই এ প্রশ্ন আমাদের মনে জাগা উচিত ছিল যে এখন যখন আমরা স্বাধীন হইয়াছি তখন আমাদের প্রগতির বা বিকাশের লক্ষ্য কি হইবে? কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় ইহাই যে এই বিষয়ে সুচিন্তিত কোন লক্ষ্য নির্ধারিত হয় নাই এবং দেশ স্বাধীন হইবার সতের বৎসর পরেও আমরা বলিতে পারি না আমাদের লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য কি?

বিভিন্ন সময়ে কংগ্রেসী ও অন্যান্যরা 'কল্যাণকর রাষ্ট্র', 'সমাজতন্ত্র', 'উদারনৈতিকতা' ইত্যাদি তাঁহাদের লক্ষ্য বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। ধুয়া তোলা হইয়াছে ঠিকই কিন্তু যে আদর্শের

কথা বলা হইয়াছে তাহা উপেক্ষিতই রহিয়া গিয়াছে। ইহা আমার নিজস্ব অভিজ্ঞতা। জনৈক বিশিষ্ট নাগরিক একদিন আমাকে বলিতেছিলেন যে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে ভালোভাবে লড়াই করা যায়; আজকাল রাজনৈতিক দলগুলিও এই কৌশলই অবলম্বন করিতেছে। সুতরাং তাহার পক্ষে এই প্রকার প্রস্তাব উত্থান কোনও বিস্ময়ের নহে। যাহা হউক, আমি তাঁহাকে প্রশ্ন করিলাম যে আমরা কর্মসূচী গ্রহণ করিব? যদি এই প্রকার সম্মিলিত ফ্রন্ট গঠিত হয় তবে তাহার কর্মসূচি বা কার্যক্রমের ধারণা অবশ্য থাকা প্রয়োজন। আমাদের অর্থনীতি কি হইবে? আমাদের বৈদেশিক নীতিই বা কি হইবে?

"এজন্য চিন্তা করিবেন না। আপনি যে নীতি ইচ্ছা তাহাই গ্রহণ করিতে পারেন। আমরা চরম সাম্যবাদ হইতে পুঁজিবাদ পর্যন্ত যে কোনও কর্মসূচি সমর্থনে প্রস্তুত।" তিনি এমন অবলীলাক্রমে এই উত্তর দিলেন যেন ইহাই স্বাভাবিক। তাঁহার কোনও নীতি গ্রহণের অসুবিধা নাই। একমাত্র উদ্দেশ্য হইল যেন তেন প্রকারেণ কংগ্রেসকে পরাজিত করা। এখনও অনেকে আছেন যাঁহারা মনে করেন যে কম্যুনিষ্ট ও অন্যান্যদের সহযোগিতাতেও কংগ্রেসকে পরাজিত করা প্রয়োজন।

এই সকল নির্বাচনে কম্যুনিষ্ট, মুসলিম লীগ, স্বতন্ত্র পার্টি, এস.এস.পি., বিদ্রোহী কংগ্রেস, আর.এস. পি. প্রভৃতি যুগ্ম অথবা বহুমুখী মৈত্রীতে আবদ্ধ হইয়াছে। ফলস্বরূপ একথা চিন্তা করা দুরূহ যে এই সকল দলের কোনও একটির কোনও নির্দিষ্ট আদর্শ আছে।

কংগ্রেসেরও ঠিক একই অবস্থা। যদিও কংগ্রেস লক্ষ্য হিসাবে গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রের কথা বলে তথাপি বিভিন্ন নেতার আচরণে একটি জিনিসই প্রমাণিত হয় যে কংগ্রেসের কোনও নির্দিষ্ট নীতি বা উদ্দেশ্য নাই। কংগ্রেসের মধ্যে গোঁড়া কম্যুনিষ্টরা আছেন। আবার সেখানে এমন লোকও আছেন যাঁহারা পুঁজিবাদে বিশ্বাসী ও উগ্র কম্যুনিষ্ট বিরোধী। কংগ্রেসে আজ সকল মতের লোকের ভিড় দেখা যাইতেছে। যদি এমন কোনও যাদুবাক্স থাকে যাহাতে সাপ ও বেজী একত্রে বাস করে তবে তাহার নাম কংগ্রেস।

আমাদের চিন্তা করিতে হইবে যে আমরা এই অবস্থায় প্রগতির পথে অগ্রসর হইতে পারিব কিনা? যদি আমরা আমাদের দেশের বর্তমান সমস্যাগুলির কারণ নির্ধারণ করিতে চাই তবে দেখিব যে আমাদের আদর্শ ও লক্ষ্য সম্বন্ধে দ্বিধাগ্রস্ততা এই বিশৃঙ্খলার মূল কারণ। আমরা একথা বুঝি যে ভারতবর্ষের পঁয়তাল্লিশ কোটি লোকের কোনও একটি বিষয়ে একমত হওয়া সম্ভবপর নয়। ইহা কোনও দেশেই হয় না। তথাপি প্রত্যেক জাতির একটি সাধারণ আশা আকাঙ্ক্ষা থাকে। যদি এ সাধারণ আকাঙ্ক্ষাকে ভিত্তি করিয়া লক্ষ্য নির্ধারণের চেষ্টা হয় তবেই সাধারণ মানুষ অনুভব করে যে জাতি ঠিক পথে অগ্রসর হইতেছে। ইহা দ্বারাই একতার মনোভাব সৃষ্টি হয়। এই কথার সত্যতা গত ১৯৬২ সালের চীনা আক্রমণের সময় প্রমাণিত হইয়াছে। সমগ্র দেশে বিরাট উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঞ্চার হইয়াছিল। সক্রিয়তা ও স্বার্থত্যাগ

বিপুলভাবে প্রকট হয় এবং সরকার ও বিভিন্ন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সেদিন বিশেষ কোনও পার্থক্য ছিল না। ইহা কি প্রকারে ঘটিল? বৈদেশিক ভ্রূকুটি আমাদের নিজেদের আত্মোপলব্ধির সহায়ক হয় এবং সমগ্র জনমানসের আকাঙ্ক্ষার অনুকূল নীতি সরকারকে গ্রহণ করতে বাধ্য করে। সমগ্র দেশে আত্মমর্যাদাবোধ জাগ্রত হইয়া উঠে।

## আমাদের সমস্যার মূল আত্ম-উদাসীনতা

আমাদের জাতীয় বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আমাদের সচেতন হওয়া প্রয়োজন। এই বৈশিষ্ট্যের কথা চিন্তা না করিলে স্বাধীনতা অর্থহীন হইয়া পড়ে। ইহার অভাবে স্বাধীনতা কখনই সমৃদ্ধি বা সুখের আস্বাদ দিতে পারে না। যতদিন পর্যন্ত আমরা আমাদের জাতীয় বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে অবহিত না হইবে, ততদিন আমরা আমাদের উন্নতি সাধন করিতে পারিব না। বৈদেশিক শাসনে এ স্বকীয় সত্তাকে দাবাইয়া রাখা হয়। এই কারণে লোকে স্বাধীনতা অর্জন করিতে চাহে, যাহাতে তাহারা তাহাদের স্বাভাবিক প্রবণতা ও চেষ্টায় সুখ ও সমৃদ্ধির অধিকারী হয়।

প্রকৃতি আজও শক্তিশালী। প্রকৃতির বিরুদ্ধে যাইবার চেষ্টা করিলে বা তাহাকে অবহেলা করিলে বিপর্যয় ঘটে। স্বাভাবিক প্রবৃত্তিকে অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু ইহার উৎকর্ষ সাধন দ্বারা সংস্কৃতিতে রূপান্তরিত করা সম্ভব। মনস্তত্ত্বে আমরা দেখি যে স্বাভাবিক প্রবৃত্তিকে দাবাইয়া রাখার চেষ্টার ফলে মস্তিষ্কের বিকার ঘটে। এই প্রকার ব্যক্তি অস্থির ও হতাশ হইয়া পড়ে। জাতিরও ব্যক্তির মত স্বাভাবিক প্রবৃত্তি দাবাইয়া রাখার চেষ্টা হইলে বিকৃতি ঘটিয়া তাহাতে বহু ব্যাধি দেখা দেয়। ভারতে যে বর্তমান সমস্যা তাহার মূল কারণ তাহার স্বকীয় (বৈশিষ্ট) বা স্বাভাবিক প্রকৃতির প্রতি ঔদাসীন্য।

## সুবিধাবাদ জনমনে অবিশ্বাস জাগাইতেছে

যাঁহারা আজ জাতিকে পরিচালিত করিতেছেন বা যাঁহারা আজ দেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক বিষয়ে অংশগ্রহণ করিতেছেন, তাঁহাদের অধিকাংশ এই মূল কারণ সম্বন্ধে অবহিত নন। ফলে আদর্শহীন সুবিধাবাদীরা রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও দেশের মধ্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতেছে। দল ও নেতাদের না আছে কোনও উদ্দেশ্য বা আদর্শ না আছে কোনও চরিত্রবত্তা। একজন লোক এক দল ছাড়িয়া অপর দলে যোগদান করিতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠাবোধ করে না। এমনকী দলীয় মৈত্রী বা দলভুক্তি কোনও আদর্শের বিচারে হয় না। হয় ক্ষমতালোভে ও নির্বাচনে সাফল্যের আশায়। ১৯৩৯ সালে শ্রীহাফিজ মহম্মদ ইব্রাহিম মুসলিম লীগ মনোনীত প্রার্থী হিসাবে নির্বাচিত হন। পরে যখন তিনি কংগ্রেসে যোগদান করিলেন তখন তিনি নীতিগতভাবে পদত্যাগ করিয়া কংগ্রেসের টিকিটে নির্বাচনে প্রার্থী হইলেন। ১৯৪৮ সালে যখন সমাজতন্ত্রীরা কংগ্রেস ত্যাগ করিলেন তখন তাঁহারাও সকলে পদত্যাগ করিয়া পুনরায় নির্ব চনে প্রার্থী হইলেন। কিন্তু ইহার

পর এই সৎ আদর্শ বিসর্জিত হইয়াছে। এখন রাজনীতিতে যেন অবাধ 'লাইসেন্স' দেওয়া হইয়াছে। ফলে জনমনে সকলের প্রতিই অবিশ্বাস জাগিতেছে। খুব কম লোকই আছেন যাঁহাদের সততা ও আদর্শ নিষ্ঠায় আজ লোকে বিশ্বাস করে। এই অবস্থার পরিবর্তন অবশ্যই প্রয়োজন; অন্যথায় সমাজে ঐক্য ও নিয়মানুবর্তিতা কখনই প্রতিষ্ঠিত হইবে না।

## আমাদের লক্ষ্য কি হইবে?

বর্তমানে সমগ্র জাতি সম্পূর্ণ দ্বিধাগ্রস্ত। কিছুলোকের মতে আমরা হাজার বৎসর পূর্বে যেখানে ছিলাম (অর্থাৎ যখন বৈদেশিক আক্রমণ প্রথম আমাদের জীবনযাত্রা বিপর্যস্ত করে) সেইখান হইতে পুনরায় আরম্ভ করা উচিত। কিন্তু জাতি একটি বস্তুখণ্ডের মত নির্জীব পদার্থ নহে যে তাহা যতদিন খুশি ফেলিয়া রাখিয়া পরে ব্যবহার করা যাইবে। এতদ্ব্যতীত একথা বলাও ঠিক হইবে না যে হাজার বৎসরের বৈদেশিক শাসন আমাদের জাতীয় জীবনস্রোতে এমন বাধার সৃষ্টি করে যে আমরা এই হাজার বৎসর সম্পূর্ণ অনড় বা নিষ্কর হইয়াছিলাম। জাতি অবশ্যই এই পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে তাহার প্রতিভা দ্বারা এই 'চ্যালেঞ্জের' মোকাবিলা করিয়াছে। আমরা আমাদের জীবনের বিকাশ করিবার এবং বৈদেশিক শাসন হইতে মুক্ত হইবার জন্য নিরলস সংগ্রাম করিয়া আসিয়াছি। আমাদের জাতীয় জীবনস্রোত কখনও রুদ্ধ হয় নাই। গঙ্গার জলস্রোতকে পিছনে লইয়া যাওয়া সম্ভবপর নহে। কাশীর গঙ্গার জল হরিদ্বারের মত স্বচ্ছ না হইতে পারে তথাপি ইহা সেই পবিত্র গঙ্গা। ইহার মধ্যে বহু উপনদী ও খালবিল আসিয়া মিশিয়াছে কিন্তু তাহাদের আর কোনও স্বতন্ত্র সত্তা নাই। গঙ্গার জলস্রোত অবিরাম বহিয়া চলিয়াছে। জাতির ক্ষেত্রেও এই সত্য প্রযোজ্য।

এতদ্ব্যতীত পৃথিবীতে আরও বহু জাতি আছে। তাহারা বিগত সহস্রবর্ষে প্রভূত উন্নতি করিয়াছে। আমাদের তখন সকল শক্তি ও লক্ষ্য স্বাধীনতা অর্জন ও নব নব বৈদেশিক আক্রমণ প্রতিরোধে নিয়োজিত ছিল। এই সময়ে বিশ্বের প্রগতিতে স্বভাবতঃই আমাদের অবদান কম। এখন আমরা যখন স্বাধীন হইয়াছি তখন যতশীঘ্র সম্ভব বিশ্বের প্রগতিশীল জাতিগুলির সহিত কাঁধে কাঁধ মিলাইয়া অগ্রসর হইবার জন্য কি সচেষ্ট হইতে হইবে না?

এ পর্যন্ত কোনও মতভেদের অবকাশ নাই। আসল অসুবিধা হয় যখন আমরা পাশ্চাত্য জাতিগুলির অগ্রগতি ও ইহার ফলাফল সম্পর্কে বিচারে অক্ষম হই। ইহাতে আরও জটিলতা সৃষ্টির কারণ পাশ্চাত্যের প্রতিনিধিরূপে ব্রিটিশরা এই দেশ দুই শত বৎসর শাসন করিয়াছে এবং এই সময়ে তাহারা যে সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছে যাহাতে ধীরে ধীরে জনমনে ভারতীয় সকল আদর্শের প্রতি উপেক্ষা ও পাশ্চাত্যের সব কিছুর প্রতি শ্রদ্ধার ভাব জাগ্রত হয়। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে আমরা তাহাদের জীবনযাপন প্রণালী, আচরণ, খাদ্যাভ্যাস প্রভৃতিও গ্রহণ করিয়াছি। বিজ্ঞান বা কারিগরী শিক্ষার সহিত পাশ্চাত্যের সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক মতবাদও আমাদের বিচারের ভিত্তি হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বর্তমানের শিক্ষিত সমাজের

প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে এই সত্য উপলব্ধি করা যাইবে। আমাদের চিন্তা করিতে হইবে যে ইহার পরিণাম ভালো না মন্দ হইবে? আমরা বৃটিশ রাজত্বকালে বিদেশী বস্ত্র বর্জন করিয়াছি কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় এই যে বৃটিশ শাসন অবসানের পর তাহাদের অন্ধ অনুকরণটি যেন অগ্রগতির প্রমাণ বলিয়া বিবেচিত হইতেছে। ইহা সত্য যে ক্ষুদ্র দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা জাতীয় প্রগতি ব্যহৃত করা অনুচিত; কিন্তু একথাও বুঝিতে হইবে যে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও পাশ্চাত্যের জীবনযাত্রা পদ্ধতি এক নহে। পাশ্চাত্যের বিজ্ঞান বিশ্বের সকলের সহিত আমাদেরও গ্রহণ করার আবশ্যকতা আছে। কিন্তু পাশ্চাত্যের জীবনযাত্রার আদর্শ বা পদ্ধতি সম্পর্কে সেকথা কখনই প্রযোজ্য নহে। প্রকৃতপক্ষে পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণ অবশ্যই বন্ধ করিতে হইবে। এদেশে এমন অনেক লোক আছেন যাঁহারা পাশ্চাত্যের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক মতবাদকে প্রগতির দিশারি বলিয়া মনে করেন এবং আমাদের দেশে সেই সকল মতবাদ আমদানি ও প্রতিষ্ঠা করিতে চাহেন। সুতরাং আমরা যখন আমাদের দেশকে কীভাবে উন্নত করিতে পারি তাহার উপায় নির্ধারণের চেষ্টা করিতেছি, তখন আমাদের পশ্চিমের বিভিন্ন অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক আদর্শ এবং তাহার বর্তমান পরিস্থিতি অবশ্যই বিবেচনা করিতে হইবে।

## পাশ্চাত্য জাতিগুলোর উত্থান

যে সকল মতবাদ পাশ্চাত্য জনমনে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছে তাহার মধ্যে প্রধান তিনটি—জাতীয়তাবাদ (Nationalism), গণতন্ত্র (Democracy) এবং সমাজতন্ত্র (Socialism)। এই সঙ্গে কিছু কিছু লোক, যাহারা বিশ্ব ঐক্য ও বিশ্ব শান্তির কথা বলেন, তাহারাও রহিয়াছেন।

ইহাদের মধ্যে জাতীয়তাবাদ সর্বাপেক্ষা প্রাচীন ও সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী। রোমান সাম্রাজ্যের পতন এবং ক্যাথলিক চার্চের প্রভাব কমিয়া গেলে ইউরোপে বিভিন্ন জাতির অভ্যুত্থান ঘটে। ইউরোপের বিগত সহস্র বর্ষের ইতিহাস বিভিন্ন জাতির উত্থান ও সংঘর্ষের ইতিহাস। এই সকল জাতি ইউরোপ মহাদেশের বাহিরে তাহাদের সাম্রাজ্য বিস্তার করে এবং অন্যান্য স্বাধীন রাষ্ট্রকে পদানত করে। জাতীয়তাবাদ জাতি ও রাষ্ট্রকে এক করিয়া একজাতীয় রাষ্ট্রে পরিণত করে, সঙ্গে সঙ্গে রোমান ক্যাথলিক চার্চের প্রভাব কমিবার ফলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ন্যাশনাল চার্চের প্রতিষ্ঠা অথবা রাজনীতিক্ষেত্রে ধর্মের প্রভাবের অবসান ঘটে। এই অবস্থার মধ্যেই 'সেকুলার' বা ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের আদর্শ সৃষ্টি হয়।

## ইউরোপে গণতন্ত্রের জন্ম

ইউরোপের রাজনৈতিক জীবনে যে বৈপ্লবিক আদর্শ বিরাট প্রভাব সৃষ্টি করে তাহা গণতান্ত্রিক আদর্শ। গোড়ার দিকে প্রত্যেক জাতির প্রধানরূপে একজন রাজা ছিল। কিন্তু ক্রমশ রাজাদের

স্বেচ্ছাচারিতা সম্পর্কে জনমনে বিরূপ ধারণার সৃষ্টি হইতে থাকে। শিল্পবিপ্লব এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্য প্রত্যেক জাতির মধ্যে এক শক্তিশালী ব্যবসায়ী সমাজের সৃষ্টি করে। স্বভাবতই এই নূতন রাজনৈতিক অধিকারের দাবিদারগণের সহিত রাজা ও ভূস্বামীগণের সংঘর্ষ ঘটে। এই সংঘর্ষ আদর্শভাবে গণতন্ত্রকে তাহাদের দার্শনিক ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করে। গণতন্ত্র প্রথম গ্রীসের নগর রাজ্য (City States) গুলির মধ্যে প্রবির্তত হয়। সাধারণ মানুষ সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইয়া এই ব্যবস্থায় আকৃষ্ট হয়। ফ্রান্সে এক রক্তক্ষয়ী বিপ্লব অনুষ্ঠিত হইল। ইংল্যান্ডের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন আন্দোলন ঘটিল। গণতন্ত্রের আদর্শ সাধারণ মানুষের মনে উদ্দীপনার সঞ্চার করে। রাজন্যপ্রথা হয় বিলুপ্ত অথবা তাহাদের ক্ষমতা হ্রাস পায়; এবং সাংবিধানিক সরকার গঠিত হয়। বর্তমানের পশ্চিমী দেশগুলিতে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। যাহারা গণতন্ত্রকে ধ্বংস করিয়াছে সেই হিটলার, মুসোলিনী ও স্ট্যালিনের মত একনায়করাও মুখে গণতন্ত্রের বুলি আওড়াইয়াছে।

## ব্যক্তিকে শোষণ করা হইয়াছে

গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় প্রত্যেক ব্যক্তি এক ভোটের অধিকারী ছিল। কিন্তু প্রকৃত ক্ষমতা তাঁহাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল যাঁহারা বিদ্রোহের নেতৃত্ব করিয়াছিলেন। শিল্প বিপ্লবের ফলে নূতন উৎপাদন ব্যবস্থায় আশার সঞ্চার করে। গৃহকার্য না করিয়া কর্মীরা কারখানায় মালিকের নির্দেশমত কার্যে রত হয়। শ্রমিক তাহার গৃহ পরিত্যাগ করিয়া শিল্প এলাকার জনবহুল শহরে বসবাস করিতে থাকে। কোনও উপযুক্ত বাসগৃহের ব্যবস্থা ছিল না। কারখানায় কর্মরত শ্রমিকের স্বার্থ রক্ষার জন্য কোনও আইনকানুন ছিল না, তাহারা অর্থাভাবে ক্লিষ্ট ও অসংগঠিত ছিল। স্বভাবতই তাহারা হয়রানি, অন্যায় ও শোষণের শিকারে পরিণত হইত। যাহাদের হাতে রাজনৈতিক ক্ষমতা ন্যস্ত ছিল তাহারা এই মালিকদের সমগোত্রীয় লোক। সুতরাং রাষ্ট্রের দ্বারা তাহাদের অভাব অভিযোগের প্রতিকারের কোনও আশাই ছিল না।

বহু ব্যক্তি এই অন্যায়ের প্রতিবাদে আন্দোলন করিয়াছেন। তাঁহারা এই সকল নিপীড়িত শ্রমিকদের অবস্থার উন্নতি সাধন করিতে চাহিয়াছিলেন। তাঁহারা নিজেদের সমাজতন্ত্রবাদী বলিয়া ঘোষণা করেন। কার্ল মার্কস তাঁহাদের অন্যতম। এই অন্যায়ের প্রতিরোধ আন্দোলন গড়িয়া তোলার উদ্দেশ্যে তিনি সমগ্র মানব সমাজের ইতিহাস ও সমাজের গঠন প্রণালী অধ্যয়ন করিয়া তাহার বিশ্লেষণ উপস্থাপিত করিলেন। তিনি দাবি করিলেন যে তাহার এই বিশ্লেষণ বৈজ্ঞানিক যুক্তির ভিত্তিতে রচিত। পরবর্তী সকল সমাজতন্ত্রবাদী তাহার এই আদর্শেই উদ্বুদ্ধ হইয়াছে।

## সর্বহারার একনায়কত্ব

মার্কসের বিশ্লেষণ দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ (Dialectic materialism)। তিনি উৎপাদনের ব্যক্তিগত মালিকানাকেই শোষণের প্রধান কারণ বর্ণনা করিয়াছেন। এই সকল উৎপাদনের মালিকানা যদি সমাজের হাতে থাকে (মার্কসবাদীদের নিকট সমাজ ও রাষ্ট্র অভিন্ন) তাহা হইলে আর শোষণের অবকাশ থাকিবে না। কিন্তু তাহার পূর্বের রাষ্ট্রকে এই সকল শোষণকারীর হস্ত হইতে মুক্ত করিতে হইবে এবং ভবিষ্যতে যাহাতে তাহাদের অভাব না থাকে তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সর্বহারার একনায়কত্ব বা Dictatorship of the Proletoriate প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। যাহাতে লোকে এই একনায়কত্ব সহ্য করে সেজন্য একটি আদর্শ ঘোষিত হইল যে যখন এই শোষক শ্রেণীকে সম্পূর্ণরূপে উৎখাত করা হইবে এবং তাহাদের পুনরায় ক্ষমতা অধিকারের সম্ভাবনা থাকিবে না। তখন এই একনায়কত্বের পরিবর্তে একটি শ্রেণীহীন, রাষ্ট্রহীন সমাজব্যবস্থা প্রবর্তিত হইবে। মার্কস আরও প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিলেন যে পুঁজিবাদের মধ্যেই তাহার ধ্বংসের বীজ নিহিত রহিয়াছে।

ইউরোপের কয়েকটি দেশে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ঘটিয়াছে। এমনকী যেখানে বিপ্লব হয় নাই সেখানেও রাজনীতি করা শ্রমিকদের অধিকার স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছে। 'কল্যাণ রাষ্ট্র' আদর্শ হিসাবে স্বীকৃত হইয়াছে—জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র বা সম অধিকার (সমাজতন্ত্রের মূলমন্ত্র সম অধিকার; সম অধিকার ও সম উপযোগিতা এক নহে— Equality is there at the root of Socialism; equality is different from equitability), এই তিনটি আদর্শই ইউরোপের সামাজিক ও রাজনৈতিক চিন্তায় প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। এই আদর্শগুলি ব্যতীতও বিশ্বশান্তি ও বিশ্ব ঐক্যের আদর্শও আছে। এই সমস্ত ভালো আদর্শ। এই সকল আদর্শই মনুষ্যত্ব বিকাশের সহায়ক। কিন্তু এককভাবে এই সকল আদর্শই অসম্পূর্ণ। শুধু তাহাই নহে ইহাদের একটি অপরটির বিরোধী। জাতীয়তাবাদ জাতিতে জাতিতে সংঘাত সৃষ্টি করিয়া বিশ্বশান্তি বিনাশে উদ্যত হয়। পুঁজিবাদী গণতন্ত্র অবাধ শোষণের অধিকার দেয়। সমাজতন্ত্র পুঁজিবাদ উচ্ছেদে গণতন্ত্র ও ব্যক্তির স্বাধিকার হরণ করে। সুতরাং পাশ্চাত্য জগৎ এই সকল আদর্শের সমন্বয়ের প্রয়াসে বিব্রত। তাহারা আজিও সফল হইতে পারে নাই। তাহারা একের সহিত অপরের গোঁজামিল দিবার চেষ্টা করিতেছে।

ইংল্যান্ড জাতীয়তাবাদ ও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার মাধ্যমে সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলার চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু ফ্রান্স তাহা করিতে পারে নাই। সেখানে গণতন্ত্র রাজনৈতিক অনিশ্চয়তার সৃষ্টি করিয়াছে। ব্রিটিশ লেবার পার্টি গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু সমাজতন্ত্র জোরদার হইয়া উঠিলে গণতন্ত্র অব্যাহত থাকিবে না বলিয়া লোকে আশংকা প্রকাশ করিতেছে। ফলস্বরূপ লেবার পার্টি আর মার্কসবাদীদের মত জোরের সঙ্গে সমাজতন্ত্রের কথা বলে না। হিটলার ও মুসলিনী জাতীয়তাবাদ ও সমাজতন্ত্রের নীতি

গ্রহণ করেন এবং গণতন্ত্রের সমাধি রচনা করেন। শেষ পর্যন্ত সমাজতন্ত্রবাদ তাহাদের জাতীয়তাবাদী অভিসন্ধি পূরণের অস্ত্র হিসাবে ব্যবহৃত হয়। ইহাতে সমগ্র বিশ্বের শান্তি ও ঐক্য বিঘ্নিত হইবার আশংকা দেখা দেয়। আমরা পশ্চিম হইতে কিছু নির্দেশ লাভের আশা করিলেও প্রকৃতপক্ষে তাহাদের দিবার মত সঠিক আদর্শ নাই। তাহারা নিজেরাই পথসন্ধিতে বিভ্রান্ত হইয়া ঘুরিতেছে এবং কোনটি প্রকতৃপক্ষে শ্রেয় তাহা নির্ধারণ করিতে পারিতেছে না। এই অবস্থায় আমরা তাহাদের নিকট কি প্রত্যাশা করিতে পারি?

পক্ষান্তরে আমাদের বিবেচনা করিতে হইবে যে বিশ্বের এই পরিস্থিতিতে ভারতের কোনও অবদান আছে কিনা। বিশ্বের প্রগতির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া আমরা কোন আদর্শ তাহাদের নিকট উপস্থাপিত করিতে পারি? যদি আমাদের নিকট এমন কোনও সম্পদ থাকে যাহা বিশ্বের অগ্রগতির সহায়ক হয় তবে তাহা অপরকে দান করিতে কুণ্ঠিত হওয়া উচিত হইবে না। এই ভেজালের যুগে নূতন কোনও সংমিশ্রণ না করিয়া আমাদের কোনও বিশেষ আদর্শ গ্রহণের পূর্বে বিচার বিশ্লেষণ করিয়া দেখিতে হইবে। পৃথিবীর পক্ষে ভারস্বরূপ না হইয়া আমাদের উচিত পৃথিবীর সমস্যা সমাধানে উদ্যোগী হওয়া। আমাদের আরও চিন্তা করিতে হইবে যে আমাদের ঐতিহ্য ও সভ্যতার বিশ্বসংস্কৃতিতে কি মহান অবদান আছে।

স্বাধীনতা লাভের পর গত সতের বৎসরের মধ্যে আমাদের সর্বাঙ্গীন উন্নতির জন্য কোনও লক্ষ্য নির্ধারিত হয় নাই। সাধারণত লোকে এই সকল প্রশ্ন স্থিরভাবে বিবেচনা করে না। তাহারা সময়বিশেষে যে সমস্যার সম্মুখীন হয় সেই সমস্যার কথাই চিন্তা করে। কখনও অর্থনৈতিক সমস্যার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়, কখনও বা রাজনৈতিক প্রশ্ন তাহাদের নিকট গুরুত্ব লাভ করে। আমরা কোন পথে চলিলে মূল সমস্যার সমাধান ও সর্বাঙ্গীন উন্নতির পথে অগ্রসর হইব তাহা না জানায় ঠিকমত উৎসাহ ও উদ্দীপনার অভাব ঘটে এবং যে ভাবে সাময়িক সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করা হয় তাহা প্রায়শ আংশিক বা একদেশধর্মী হয়।

# ২ অতীত বনাম বর্তমান

যাঁহারা কোনও স্থির লক্ষ্যের কথা বলেন তাঁহাদের মধ্যে দুই প্রকারের লোক আছেন। একদল বলেন যে পরাধীনতার পূর্বেকার অবস্থায় ফিরিয়া যাওয়া উচিত এবং সেইখান হইতে পুনরায় কার্য আরম্ভ করা আবশ্যক। পক্ষান্তরে, আর একদল আছেন যাঁহার ভারতের কোনও মহান অবদান আছে বলিয়া বিশ্বাস করেন না এবং আমাদের অতীত ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে চিন্তা করিতে চাহেন না। তাহাদের নিকট পাশ্চাত্যের জীবন ও চিন্তাধারাই প্রকৃষ্ট এবং আমাদের উন্নতি করিতে হইলে সেই জীবন পদ্ধতি ও আদর্শবাদ গ্রহণ করিতে হইবে। কিন্তু এই দুইটি গোষ্ঠীরই চিন্তাধারা ভ্রমাত্মক। যেহেতু এই দুইটির মধ্যে আংশিক সত্যতা আছে, সুতরাং তাহাদের সম্পূর্ণ ভাবে এড়াইয়া যাওয়াও অনুচিত।

যাঁহারা বলেন যে আমাদের সেই প্রাচীনকাল হইতে পুনরায় আরম্ভ করা উচিত, তাঁহারা ভুলিয়া যান যে ইহা আকাঙ্ক্ষিত হউক বা না হউক বর্তমানে সেটা অসম্ভব। সময়ের স্রোত কখনই ফিরাইয়া দেওয়া যায় না।

## অতীতকে অস্বীকার করা চলে না

বিগত সহস্র বৎসর যাহা আমরা গ্রহণ করিয়াছি অথবা যাহা আমাদের উপর চাপাইয়া দেওয়া হইয়াছে বর্তমানে তাহা বাদ দেওয়া অসম্ভব। তদুপরি আমাদের সমাজজীবন গঠনে আমাদের নিজস্ব অবদানও কম নাই। আমাদের সম্মুখে যে সকল সঙ্কট দেখা দিয়াছিল আমরা শুধু তাহার নিষ্ক্রিয় দর্শক ছিলাম না। অথবা আমরা শুধু বিদেশীদের কার্যের প্রতিরোধই করিয়াছি একথাও ঠিক নহে। আমরা আমাদের ভবিষ্যৎ জীবন নূতন যুগের প্রয়োজন অনুযায়ী গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করিয়াছি। অতএব গত হাজার বৎসরকাল যাহা ঘটিয়াছে সে সম্বন্ধে আমাদের চক্ষু বন্ধ করিয়া থাকা সম্ভবপর নহে।

## বৈদেশিক আদর্শ বিশ্বব্যাপী নহে

ঠিক সেই জন্য যাঁহারা পাশ্চাত্য আদর্শকে আমাদের প্রগতির জন্য প্রয়োজনীয় মনে করেন তাঁহারা ভুলিয়া যান যে সকল আদর্শ বিশেষ বিশেষ সময়ে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে প্রকট

হইয়াছে। এইগুলির সমস্তই সমগ্র মানব সমাজের কল্যাণকর একথা বলা চলে না। এই আদর্শগুলি যে সমাজ বা রাষ্ট্রের সাংস্কৃতিক পটভূমিকায় জন্মলাভ করিয়াছে তাহা প্রায়ই সেই সমাজের সংস্কৃতির সীমা লঙ্ঘন করিতে পারে না। এতদ্ব্যতীত এইগুলির মধ্যে বহু আদর্শ আজ মৃত বা এ যুগের সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। কার্ল মার্কসের আদর্শও সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এবং বিভিন্ন রাষ্ট্রের পরিস্থিতি অনুযায়ী এমনভাবে পরিবর্তিত হইয়াছে যে শুধু মার্কসীয় মতবাদ তোতাপাখির মত আওড়াইলেই তাহা আমাদের দেশের সমস্যাগুলির সমাধান করিতে পারিবে না এবং অন্ধ অনুকরণ বৈজ্ঞানিক যুক্তি তথ্যের পরিবর্তে প্রতিক্রিয়াশীল মনোভাব সৃষ্টি করিবে। ইহা সত্যই বিস্ময়কর যে যাহারা অতীতের মৃত আদর্শগুলি দূরে ফেলিয়া দিতে চাহেন, তাঁহারাই আবার বিদেশের কতকগুলি প্রাচীন ও বর্তমানের অনুপযোগী আদর্শ প্রতিষ্ঠা করিতে চেষ্টা করেন।

## আমাদের দেশ ও আমাদের সমস্যা

প্রত্যেক দেশের তাহার বিশেষ ঐতিহাসিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা বর্তমান এবং দেশের নেতারা দেশের সমস্যাগুলি দেশের পটভূমিকায় পর্যালোচনাপূর্বক সমাধানে প্রয়াসী হন। একথা যুক্তিহীন যে একদেশের নেতৃবৃন্দের কোনও সমস্যা সমাধানের উপায় বা পদ্ধতি সব দেশেই সমানভাবে প্রযোজ্য হইবে। একটি ছোট উদাহরণ দ্বারা ইহা পরিস্ফুট হইবে। যদিও মানুষের শরীরের অঙ্গ ও গঠনভঙ্গি সমস্ত পৃথিবীতে একই প্রকার, তথাপি যে ঔষধ ইংল্যান্ডের লোকের পক্ষে উপযোগী, ভারতের লোকের পক্ষে তাহা অনুপযুক্ত। ব্যাধি, আবহাওয়া, জল, খাদ্যাভাস ও বংশের উপর নির্ভরশীল। এমনকী বাহিরের উপসর্গ একপ্রকার মনে হইলেও একই ঔষধ সকল রোগীর ব্যাধির উপশমে সক্ষম হয় না। যাহারা একই প্রকার ব্যবস্থাপত্র সকল রোগীর প্রতি প্রয়োগ করেন তাহাদের বৈজ্ঞানিক চিকিৎসক না বলিয়া হাতুড়ে ডাক্তার বলিয়া অভিহিত করা হয়। এইজন্য আয়ুর্বেদে বলা হইয়াছে যে একস্থানের ব্যাধির প্রতিকার ব্যবস্থা সেইস্থানেই অনুসন্ধান করিতে হইবে। সুতরাং কোনও বিশেষ বৈদেশিক মতবাদ সকল ক্ষেত্রে ঠিক সেইভাবে আমাদের দেশের সমস্যা সমাধানের জন্য প্রযোজ্য নহে, সমীচীনও নহে। ইহা দ্বারা সুখ ও সমৃদ্ধি লাভ হয় না।

## মানব জ্ঞান সকলের সম্পদ

পক্ষান্তরে একথাও অনুধাবনের প্রয়োজন যে সকল চিন্তাধারা ও আদর্শ (তাহা যেখানেই উদ্ভূত হউক না কেন) সর্বদা শুধু বিশেষ ক্ষেত্র বা সময়ে মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিবে এমনও নহে। কোনও বিশেষ ক্ষেত্রে বা বিশেষ সময়ে যাহা মানব কল্যাণে নিয়োজিত হয় তাহা কোনও কোনও সময় বৃহত্তর মানব সমাজের পক্ষেও কল্যাণকর হইতে পারে। সুতরাং অপরাপর সমাজের অতীত ও বর্তমান প্রগতিকে একেবারে অগ্রাহ্য করাও বিজ্ঞোচিত নয়। এই সমস্ত

উন্নতির মূলে যে সত্য নিহিত তাহা অবশ্যই অনুধাবন করিতে হইবে। অন্য অবান্তর বস্তুগুলিকেও তেমনি সযত্নে পরিহার করিতে হইবে। বৈদেশিক সমাজের জ্ঞান আহরণের সহিত সেই সমাজের ভ্রান্তি ও বিকৃতি যেন আমাদের কলুষিত না করে। ইহার মধ্যে যে সকল শাশ্বত সত্য আমাদের সমাজে সৃষ্ট তাহা যেমন বর্তমানের পরিপ্রেক্ষিতে সংশোধিতরূপে গ্রহণ করিতে হইবে, তেমনই অন্যান্য সমাজে যে শাশ্বত সত্যের বিকাশ ঘটিয়াছে তাহাও আমাদের দেশ ও সমাজের অবস্থা অনুযায়ী সংশোধিতরূপে গ্রহণ করিতে হইবে।

## সংঘর্ষমূলক আদর্শ

পাশ্চাত্য রাজনৈতিক চিন্তা জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রকে তাহাদের আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করিয়াছে। এতদ্ব্যতীত সময়ে সময়ে বিশ্ব ঐক্যের আদর্শ জাতিপুঞ্জ (League of Nations) বা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর রাষ্ট্র সঙ্ঘের (U.N.O) মধ্যে মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে। বিভিন্ন কারণে এগুলি সাফল্য লাভ করিতে পারে নাই। যাহা হউক ইহাদের মাধ্যমে এই আদর্শ সার্থক করার চেষ্টা হইয়াছে।

## এই সকল আদর্শ কার্যতঃ অসম্পূর্ণ এবং পরস্পর বিরোধী

জাতীয়তাবাদ জাতিতে জাতিতে সংঘর্ষ এবং বিশ্বযুদ্ধের কারণ হইয়াছে। যদি বর্তমান অবস্থা বজায় রাখা বিশ্বশান্তি বলিয়া অভিহিত হয় তবে তাহার অর্থ এই হইবে সে বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতির স্বাধীনতা লাভের আকাঙ্ক্ষা কখনই পূর্ণ হইবে না। বিশ্ব ঐক্য ও জাতীয়তাবাদের মধ্যে পরস্পর সংঘর্ষ হইতেছে। অনেকে বিশ্ব ঐক্যের জন্য জাতীয়তাবাদ বর্জন করিতে বলেন; আবার অনেকের মতে বিশ্ব ঐক্য অবাস্তব কল্পনা এবং জাতীয় স্বার্থের উপরেই তাঁহার গুরুত্ব আরোপ করেন।

গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের সমন্বয় সাধন প্রয়াসেও ঠিক এই প্রকার অসুবিধা দেখা দেয়। গণতন্ত্রে ব্যক্তি-স্বাধীনতা স্বীকৃত হইয়াছে কিন্তু পুঁজিবাদী সমাজ ইহাকে একাধিপত্য ও শোষণের অবসান হিসাবে ব্যবহার করিয়াছে। সমাজতন্ত্রবাদ শোষণের অবসানের জন্য প্রবর্তিত হইলেও ব্যক্তি-স্বাধীনতা ও মর্যাদা হরণ করিয়াছে।

সমস্ত মানব সমাজ বিভ্রান্ত হইয়া ভবিষ্যৎ উন্নতির সঠিক পন্থা নির্ধারণ করিতে চেষ্টা করিতেছে। পশ্চিম আজ দৃঢ়তার সহিত ঘোষণা করিতে পারিতেছে না অন্য কিছু নহে, কেবল ইহাই বর্তমানে সঠিক ও This alone and no other । তাহারা নিজেরাই অন্ধকারে পথ হাতড়াইতেছে। সুতরাং পশ্চিমের আদর্শ অনুসরণের অর্থ এক অন্ধ কর্তৃক অপর অন্ধের পরিচালনা। এই অবস্থায় আমাদের ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতি দৃষ্টিপাত করার প্রয়োজন অনুভূত হয়। ইহা কি সম্ভব যে আমাদের সংস্কৃতি বিশ্বকে দিগ্‌দর্শন ক রিতে পারে?

জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষেত্রে প্রথমেই সংস্কৃতির প্রতি লক্ষ্য করিতে হইবে, কারণ ইহাই আমাদের প্রকৃতি। স্বাধীনতা আমাদের সংস্কৃতির সহিত অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত। যদি সংস্কৃতি ভিত্তি না হয় তবে স্বাধীনতার জন্য রাজনৈতিক আন্দোলন শুধু স্বার্থপর ও সুবিধাবাদীদের আসরে পরিণত হইবে। স্বাধীনতা তখনই অর্থপূর্ণ হয় যখন তাহা আমাদের সংস্কৃতির বিকাশের সহায়ক হয়। এই সংস্কৃতির বিকাশ শুধু আমাদের প্রগতির সহায়ক নয়, ইহা আমাদের আনন্দেরও কারণ হয়। সুতরাং জাতীয় ও মানবীয় উভয় দিক হইতেই আমাদের ভারতীয় আদর্শের কথা বিশেষভাবে চিন্তা করা প্রয়োজন। যদি ইহার দ্বারা আমরা পশ্চিমের বিভিন্ন আদর্শের সমন্বয়ে সাধন করিতে পারি তবে তাহা আমাদের অধিকতর সার্থকতা দান করিবে। পাশ্চাত্যের এই সকল নীতি মানবীয় বিচার বিশ্লেষণ এবং সামাজিক সংঘাতপ্রসূত। এই নীতিগুলি মানুষের কোনও না কোনও আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতীক, সুতরাং এই সকল চিন্তাধারাকে কখনই উপেক্ষা করা উচিত হইবে না।

## জাতীয় সংস্কৃতি ঐক্যের প্রতিচ্ছবি

ভারতীয় সংস্কৃতির প্রথম বৈশিষ্ট্য এই যে তাহা মানব জীবনকে এক পূর্ণরূপে প্রত্যক্ষ করিয়াছে। ইহাকে একাত্ম মানবদর্শন রূপে অভিহিত করা যায়। কোনও বিশেষ অঙ্গের কথা বিশেষজ্ঞদের বিবেচনার বিষয় হইতে পারে কিন্তু ইহা সাধারণ জীবনে অপ্রয়োজনীয়। পাশ্চাত্যের বিভ্রান্তির প্রধান কারণ ইহা জীবনকে পূর্ণভাবে না দেখিয়া আংশিকভাবে বিচার করিয়াছে এবং পরে তাহা সংযুক্ত করিয়া এক পরিপূর্ণ মানবের রূপ দিবার চেষ্টা করিয়াছে। আমরা স্বীকার করি যে জীবনে পার্থক্য এবং বিভিন্নতা আছে; কিন্তু আমরা সর্বদা তাহার পশ্চাতে যে সামঞ্জস্য বা ঐক্যবোধ বিরাজ করিতেছে তাহাই আবিষ্কার করিতে চেষ্টা করিয়াছি। এই প্রচেষ্টা বিজ্ঞানসম্মত। বৈজ্ঞানিকরা সর্বদা বিশ্বের যে বিশৃঙ্খলা আপাতদৃষ্টিতে দেখা যায় তাহার মধ্যে যে ঐক্য বিরাজ করিতেছে তাহাই আবিষ্কারের চেষ্টা করেন। যে নীতিতে বিশ্বজগৎ পরিচালিত হইতেছে তাহা বিবেচনা করিয়াই তাহাদের নীতি নির্ধারণ করেন। রাসায়নিকরা আবিষ্কার করিয়াছেন যে কয়েকটি উপাদান সমগ্র পার্থিব জগৎ সৃষ্টি করিয়াছে। পদার্থবিদরা আরও একপদ অগ্রসর হইয়া প্রমাণ করিয়াছেন যে এই সকল উপাদানের মূল কেবল energy বা শক্তি। আমরা আজ জানিয়াছি যে সমগ্র বিশ্ব শুধু কতকগুলি energy বা শক্তির সমষ্টি।

দার্শনিকরাও মূলত বৈজ্ঞানিক। পাশ্চাত্য দেশের দার্শনিকরা দ্বান্দ্বিক নীতি (Principle & quality) পর্যন্ত পৌঁছিয়াছেন। হেগেল থিসিস, অ্যান্টিথিসিস ও সিনথিসিসের নীতি আলোচনা করিয়াছেন। কার্ল মার্কস ডারইউনের মতে Survival of the Fittest বা শুধু শক্তিশালীরাই বাঁচার অধিকারী। কিন্তু এই দেশে আমরা সমস্ত জীবের মধ্যে মূলগত ঐক্য লক্ষ্য করিয়াছি। এমনকী যাঁহারা সংঘর্ষবাদী তাঁহারও প্রকৃতি ও মনের মধ্যে সংঘর্ষ অপেক্ষা সমন্বয়ের রূপ প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। বৈচিত্র্য তাহার অন্তর্নিহিত ঐক্যের প্রকাশ। বীজ হইতে মূল, কাণ্ড,

শাখা-প্রশাখা, পত্র, পুষ্প ও ফল দেখা দেয়। ইহাদের প্রত্যেকটির রূপ ও রং বিভিন্ন। এমনকী তাহাদের মধ্যে গুণগত পার্থক্যও আছে। তথাপি একই বীজ হইতে উদ্ভূত বলিয়া মূলতঃ তাহারা ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে সম্পর্কিত।

## পারস্পরিক সংঘাত সাংস্কৃতিক অবনতির কারণ

বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের বিকাশ ভারতীয় সংস্কৃতির প্রধান আদর্শ। এই সত্য সর্বান্তকরণে গৃহীত হইলে বিভিন্ন শক্তির মধ্যে সংঘর্ষের অবকাশ থাকে না। সংঘর্ষ প্রকৃতি ও সংস্কৃতির লক্ষণ নহে, ইহা বরং তাহার অবনতির কারণ। জংলি নীতি এই তথ্য—যাহা সম্প্রতি পাশ্চাত্যের লোকে আবিষ্কার করিয়াছে তাহা আমাদের দেশের দার্শনিকগণের অজানা ছিল না।

আমরা লোভ, ক্রোধ ইত্যাদিকে (ছয়টি নীচ প্রবৃত্তি) মানুষের অবনতি কারণ বলিয়া মনে করি। আমরা এগুলিকে সভ্য জীবন বা সংস্কৃতির মান হিসাবে কখনই গ্রহণ করি নাই। সমাজে দস্যু তস্কর অবশ্যই আছে। ইহাদের হাত হইতে সমাজকে রক্ষা করার প্রয়োজন আছে। কিন্তু ইহাদেরই সমাজের মান হিসাবে কখনই মনে করিতে পারি না। Survival of the fittest বা 'জোর যার মুলুক তার' ইহা অরণ্যের নীতি। সভ্যতা এই নীতির উপর ভিত্তি করিয়া গড়িয়া উঠে নাই, বরং মানুষের জীবনে এই নীতি যত কম প্রযুক্ত হয় তাহারই এই নীতি যত কম প্রযুক্ত হয় তাহারই চেষ্টা হইয়াছে। যদি আমরা প্রগতি বা উন্নতি চাই তবে আমাদের সমাজ বিবর্তনের ইতিহাস অবশ্যই স্মরণ রাখিতে হইবে।

## পারস্পরিক সহযোগিতা

পৃথিবীতে যেমন সংঘাত ও প্রতিযোগিতা আছে তেমন সহযোগিতাও আছে। বৃক্ষ, লতাদি ও জীবজগৎ পরস্পরকে জীবনধারণে সহায়তা করে। আমরা বৃক্ষাদি হইতে অক্সিজেন গ্রহণ করি এবং তাহাদের কার্বন-ডাই-অক্সাইড সরবরাহ করি। এইভাবে পারস্পরিক সহযোগিতা পৃথিবীতে জীবনধারা অব্যাহত রাখিয়াছে। পরস্পরকে বাঁচাইয়া রাখার জন্য যে বিভিন্ন প্রকার প্রাণের সহযোগিতা তাহার উপলব্ধিই সভ্যতার প্রধান বৈশিষ্ট্য। 'প্রকৃতিকে' সামাজিক উদ্দেশ্যে রূপান্তরিত করার নামই 'সংস্কৃতি'। কিন্তু যখন ইহা সামাজিক সংঘর্ষের কারণ হয় তখনই তাহা 'বিকৃতি' নামে অভিহিত হয়। সংস্কৃতি প্রকৃতিতে অবহেলা বা অস্বীকার করে না। ইহা বরং প্রকৃতির যে সকল উপাদান এই বিশ্বজীবনে সামঞ্জস্য বিধানে সক্ষম তাহারই বিকাশ দ্বারা পূর্ণ জীবন গঠনের প্রয়াস পায়। ভ্রাতা-ভগ্নী, মাতা-পুত্র, পিতা-পুত্রের সম্পর্ক স্বাভাবিক। ইহা মানুষ ও জন্তু জানোয়ার সকলের মধ্যেই সমান। জন্তুদের স্মৃতিশক্তি হীনতার জন্য এই সম্পর্ক ক্ষণস্থায়ী। তাহারা এই সম্পর্কের ভিত্তিতে সভ্যতা বা ঐতিহ্য গড়িয়া তুলিতে পারে না। কিন্তু মানুষ ইহার ভিত্তিতে সুশৃঙ্খল জীবন গড়িয়া তোলে এবং এই মূল সম্পর্কের উপর ভিত্তি করিয়া সমগ্র সমাজকে আত্মীয়তার সূত্রে গ্রথিত করিয়া সহযোগী মনোভাবে উদ্বুদ্ধ হয়।

এইভাবে বিভিন্ন জীবনমান ও পরম্পরার সৃষ্টি হয়। ভালো এবং মন্দ এই দুইটি সত্য এইভাবেই নির্ধারিত হয়। সমাজে আমরা ভাইদের মধ্যে প্রীতি ও বিদ্বেষ উভয় ভাবই দেখিতে পাই। কিন্তু আমরা প্রীতির ভাবকে ভালো মনে করি এবং ভ্রাতৃভাব বৃদ্ধি কামনা করি। বিদ্বেষের ভাব কেহই কখনও সমর্থনীয় মনে করে না। যদি সংঘর্ষ শত্রুতাকে মানুষের মূল সম্পর্কের ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করা হয় এবং এই দৃষ্টিভঙ্গি হইতে যদি ইতিহাসের পর্যালোচনা করা হয় তাহা হইলে বিঘ্ন ঐক্যের আদর্শ স্বপ্নই থাকিয়া যাইবে।

মা তাহার সন্তানদের লালন পালন করে। মাতৃস্নেহ সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। শুধু এই ভাব হইতেই আমরা সমগ্র মানবজাতির আদর্শ, নীতিও নিয়মাবলি নির্ধারণ করিতে পারি। কখনও কখনও সন্তানদের প্রতি মাতার নিষ্ঠুরতার ঘটনাও প্রত্যক্ষ করা যায় বা স্বার্থপরতার ভাব প্রকট হয়। কোনও কোনও জন্তু তাহার আত্মজকে উদরাসাৎ করিয়া ক্ষুধা নিবৃত্তি করে। পক্ষান্তরে বানরীমাতা তাহার সন্তানকে মৃত্যুর পরেও বহুকাল পর্যন্ত বক্ষে ধরিয়া রাখে। জীবজগতে উভয় প্রকার আচরণই দৃষ্টিগোচর হয়। সভ্যজীবন ও সমাজের জন্য এই দুই প্রকার আচরণের মধ্যে কোনটি গ্রহণীয় হইবে? আমরা অবশ্যই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইব যে, যে আচরণ দ্বারা জীব বাঁচিয়া থাকে তাহাই সভ্যতার বিকাশের জন্য বরণ করিতে হইবে। মানব প্রকৃতিতে দুই প্রকার প্রবৃত্তিই রহিয়াছে। এক, ক্রোধ ও লোভ। দুই, প্রীতি ও স্বার্থত্যাগ। ইহাদের সবগুলিই আমাদের প্রকৃতির অন্তর্গত। ক্রোধ ইত্যাদি মানুষকে পশুতে পর্যবসিত করে। সুতরাং যদি আমরা ক্রোধকে আমাদের জীবনের ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করি এবং সেইভাবে আমাদের শক্তিকে পরিচালিত করিতে চাই তবে তাহা জীবনে সমন্বয়ের আদর্শের অবসান ঘটাবে। এমনকী যদি ক্রোধের কারণও ঘটে তথাপি তাহা সংযত করারই চেষ্টা করা উচিত। এইভাবে সংযমই জীবনের মান হিসাবে গৃহীত হইয়াছে, ক্রোধকে কেহ কখনই বাঞ্ছনীয় মনে করে নাই।

এই বিষয়গুলিই হইল জীবনদর্শনের নীতি। এই নীতি কোনও একজন বিশেষ ব্যক্তির সৃষ্টি নহে, এগুলি আবিষ্কৃত সত্য। ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ মাধ্যাকর্ষণ শক্তি। যদি আমরা একটি প্রস্তর উর্ধ্বে নিক্ষেপ করি তবে তাহা পুনরায় মাটিতে ফিরিয়া আসে। এই নিয়ম নিউটন কর্তৃক প্রবর্তিত হয় নাই, তিনি এই সত্য আবিষ্কার করিয়াছেন। যখন তিনি বৃক্ষ হইতে আপেল পড়িতে দেখিলেন তখন তিনি উপলব্ধি করিলেন যে নিশ্চয়ই ইহার মূলে এই কারণ বর্তমান। ঠিক এইভাবেই মানব জীবনে আচরণীয় কতকগুলি নীতি নির্ধারিত হইয়াছে। যাহা মানুষের প্রকৃতির মধ্যেই বর্তমান ছিল, যাহার দ্বারা সমাজ ও সভ্যতা উপকৃত হইয়াছে এবং এইজন্য ক্রোধের উপসম ঘটানো প্রয়োজন। এইভাবেই মানবের জীবনাদর্শ রচিত হইয়াছে।

পরস্পরের নিকট মিত্যা কথা বলিও না, যাহা সত্য বলিয়া জান তাহাই বলিবে—ইহা একটি নীতি। ইহার উপযোগিতা জীবনের প্রতি পদক্ষেপে অনুভূত হয়। আমরা সত্যবাদী

লোককে শ্রদ্ধা করি। আমরা মিথ্যাকথা বলিলে নিজেরাই অসুখী হই। ইহার ভিত্তিতে জীবন চলিতে পারে না। ইহাতে শুধু বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়।

## এই সকল সিদ্ধান্তই আমাদের ধর্ম

একই শিশু প্রকৃতিগতভাবে মিথ্যাবাদী নয়; প্রায়ই পিতা-মাতারা শিশুকে মিথ্যা কথা বলিতে প্ররোচিত করে। যখন শিশু কিছু পাইতে চাহে এবং পিতামাতা তাহা না দিতে চাহেন তখন তাঁহারা উক্ত দ্রব্যটি সরাইয়া রাখিয়া বলেন যে শিশু যাহা চাহে তাহা অদৃশ্য হইয়াছে। শিশু কয়েকবার বিভ্রান্ত হয় কিন্তু সে শীঘ্রই বুঝিতে পারে যে প্রকৃত অবস্থা কি এবং সেও মিথ্যাকথা বলিতে শিখে। মানুষ স্বভাবতই সত্য কথা বলে। এই সত্য যেমন আবিষ্কৃত হইয়াছে, তেমনই জীবন যাত্রার অপরাপর নীতি নিয়মও একইভাবে নির্ধারিত হইয়াছে। ইহা কাহারও খেয়াল খুশি মত রচিত হয় নাই। ভারতবর্ষের এই নীতিগুলিরই নাম ধর্ম। যে সকল নীতি জীবনে শৃঙ্খলা, প্রগতি ও শান্তি আনয়ন করে তাহাই এদেশে ধর্ম নামে অভিহিত হইয়াছে। এই নীতি বা ধর্মের কষ্ঠিপাথরে বিচার করিয়া আমরা জীবনকে একাত্ম ও পূর্ণরূপে বিশ্লেষণ করিতে চেষ্টা করিব।

যখন প্রকৃতিকে নীতি বা ধর্মের অনুশাসনে পরিচালিত করা হয় তখনই সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিকাশ ঘটে। এই সংস্কৃতিই মানব জীবন রক্ষা ও উন্নতির কারণ। ধর্ম এদেশে নিয়ম বা নীতি হিসাবে ব্যবহৃত হইয়াছে। ইংরাজি 'রিলিজিয়ন' ধর্মের সঠিক পরিভাষা নহে। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে একাত্মীভূত জীবন হইল ভিত্তি এবং নীতি ও নিয়ম এই সংস্কৃতির আধার ও তাহার উদ্দেশ্য ও আদর্শ প্রতিষ্ঠার উপায়।

## ব্যক্তির সুখ

আমরা জীবনকে একাত্মরূপে চিন্তা করিবার সময় শুধু সামাজিক জীবন হিসাবে বিচার করি নাই—ব্যক্তিগত জীবনেও তাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছি। সাধারণত কোনও ব্যক্তিকে একজন শারীরিক জীব হিসাবে চিন্তা করা হয়। শারীরিক সুখ ও বিলাসই তাহার সুখ বলিয়া বিবেচিত হয়। কিন্তু আমরা জানি যে মানসিক উৎকণ্ঠা শারীরিক সুখ নষ্ট করে। প্রত্যেক লোকই শারীরিক সুখ লাভ করিতে চায়। কিন্তু যদি কোনও লোককে বন্দী করিয়া রাখিয়া উৎকৃষ্ট খাদ্য ও আরামের ব্যবস্থা করা হয় তবে কি সে সুখী হয়? যে কোনও সুস্বাদু খাদ্যের সহিত সামান্য কয়েকটি কটু বাক্য মানুষকে আহারের সুখ হইতে বঞ্চিত করে। মহাভারতের একটি ঘটনা বহুবিদিত। যখন ভগবান কৃষ্ণ পাণ্ডবদের দূত হিসাবে হস্তিনাপুরে যান তখন দুর্যোধন তাঁহাকে রাজ আতিথ্য গ্রহণে আহ্বান করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার আমন্ত্রণ গ্রহণ না করিয়া বিদুরের গৃহে গমন করেন। এই মহামান্য অতিথির আগমনে উল্লাসিত বিদুরপত্নী তাঁহাকে খুদের অন্ন থোড়ের

ব্যঞ্জন ভোজন করিতে দিয়াছিলেন। এই কারণেই আগ্রহ সহকারে যদি সামান্য আহার্য বস্তু কাহারও সম্মুখে উপস্থাপিত করা যায়, তবে তাহা ঘৃণার সহিত প্রদত্ত রাজভোগ অপেক্ষাও লোকের উপাদেয় মনে হয়। এইজন্য শারীরিক সুখ শুধু নয়, মানসিক সুখের কথাও অনুধাবন করা প্রয়োজন।

এইভাবে চিন্তার সুখ সম্বন্ধেও বিবেচনা করা আবশ্যক। কোনও ব্যক্তি শারীরিক সুখ, প্রাধান্য ও প্রীতি সব কিছুই যদি প্রাপ্ত হয় (যাহাতে মানসিক ও শারীরিক সুখ লাভ ঘটে), তথাপি তাহার যদি চিন্তাধারায় বিভ্রান্তি থাকে তবে তাহা এক প্রকার মানসিক বিকারের অবস্থা সৃষ্টি করে। মানসিক বিকৃতি কি? একজন মস্তিষ্কবিকৃত লোক সকল প্রকার শারীরিক স্বাচ্ছন্দ্য, স্বাস্থ্য, সম্পদ এবং স্নেহে জীবন যাপন করিলেও তাহারা চিন্তা সুখ হইতে বঞ্চিত হয়। চিন্তার শান্তিও একান্ত প্রয়োজনীয়। আমাদের এই সকল বিষয়ই বিবেচনা করিতে হইবে।

## মানুষের রাজনৈতিক আকাঙ্ক্ষা

একজন ব্যক্তির মধ্যে শরীর, মন, বুদ্ধি ও আত্ম এই চারিটিই বর্তমান। কিন্তু এগুলি একাত্মভূত। আমরা কোনও একটিকে পৃথক করিয়া চিন্তা করিতে পারি না। পশ্চিমে যে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হইয়াছে তাহার কারণ তাঁহারা এই সকল বিষয় পৃথকভাবে চিন্তা করিয়াছেন। ইহাদের পরস্পরের সম্পর্কের কথা তাঁহারা অনুধাবন করেন নাই। যখন গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার দাবিতে আন্দোলন চলিতেছিল তখন তাঁহারা ঘোষণা করিলেন যে Man is a political animal অর্থাৎ মানুষ একটি রাজনৈতিক জীব। সুতরাং তাহার রাজনৈতিক আকাঙ্ক্ষা পূরণ হওয়া প্রয়োজন। কেন শুধু একজন লোক রাজা হইবে এবং বাকি সকলে তাহার প্রজা থাকিবে? প্রত্যেককেই শাসনের অধিকার দাও। এই রাজনৈতিক মনুষ্যকে সন্তুষ্ট করার জন্য ভোটের অধিকার প্রদত্ত হইল। সে ভোটের অধিকার পাইল বটে কিন্তু সেই সঙ্গে তাহার অন্য কতকগুলি অধিকার খর্ব হইল। তখন প্রশ্ন উঠিল, ভোটের অধিকার খুব ভালো কিন্তু খাওয়ার কি হইবে? তাহাদের বলা হইল, "এখন যখন ভোটের অধিকার পাইয়াছ তখন তুমিই তো রাজা। তবে চিন্তা করিতেছ কেন?" কিন্তু লোক উত্তর দিল, "আমি যদি খাদ্য না পাই তবে এই রাজ্য লইয়া কি করিব? আমাদের এই ভোটের অধিকার কোন কাজে লাগিবে? আমাকে আগে রুটি দাও।" তখন কার্ল মার্কস আসিলেন এবং বলিলেন "হ্যাঁ, রুটি সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় বস্তু। রাষ্ট্র শুধু বড়লোকদের, সুতরাং আমাদের রুটির জন্য লড়াই করিতে হইবে।" তাঁহারা দৃষ্টিতে মানুষ কিন্তু প্রাথমিক ভাবে শরীরের সমষ্টি—যাহা রুটির অভিলাষী। কিন্তু যাঁহারা কার্ল মার্কসকে অনুসরণ করিলেন তাঁহারা দেখিলেন যে তাঁহারা না পাইলেন রুটি, না পাইলেন ভোটের অধিকার।

অপরদিকে আমেরিকা, সেখানে ভোটের অধিকার ও রুটির প্রাচুর্য রহিয়াছে। কিন্তু তথাপি সেখানে সেখানে সুখ ও শান্তি নাই। আমেরিকায় আত্মহত্যার ঘটনা এবং মানসিক রোগ

সর্বাধিক। বহুলোককে শান্ত করিয়া ঘুম পাড়াইবার জন্য ঔষধ প্রয়োগ করিতে হয়। মানুষ এই নূতন পরিস্থিতিতে দিশাহারা হইয়া পড়িয়াছে। মানুষ ভোটের অধিকার পাইয়াছে, রুটিও পাইয়াছে তবুও তাহারা সুখ ও শান্তি পায় না কেন। এখন তাহারা শান্তির নিদ্রা ফিরিয়া পাইতে চায়। বর্তমানের আমেরিকায় গভীর নিদ্রা একটি দুর্লভ বস্তু। যাঁহারা চিন্তা করেন তাঁহারা উপলব্ধি করেন যে কোথাও কোনও ভ্রান্তি আছে—যাহার ফলে জীবনে সকল উৎকৃষ্ট বস্তু লাভ করিয়াও তাহারা অসুখী।

ইহার একমাত্র কারণ এই যে তাহারা পূর্ণ মানবসত্তার কথা চিন্তা করে নাই। আমাদের দেশে আমরা এই বিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে চিন্তা করিয়াছি। এইজন্যই আমরা বলিতে পারিয়াছিলাম যে মানুষের প্রগতির অর্থ তাহার শরীর, মন, বুদ্ধি ও আত্মার পরিতৃপ্তি। প্রায়ই একটি কথা শোনা যায় যে ভারতীয় সংস্কৃতি শুধু আত্মার মুক্তির কথাই চিন্তা করিয়াছে। ইহা অপর কোনও বিষয় বিবেচনা করে নাই। ইহা ভ্রান্ত ধারণা। আমরা আত্মার কথা চিন্তা করিয়াছি। কিন্তু ইহা সত্য নয় যে আমরা শরীর, মন ও বুদ্ধির উপর কোনও গুরুত্ব আরোপ করি নাই। অন্যেরা শুধু শরীরের উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়াছে; সুতরাং আত্মা সম্পর্কে আমাদের বিশ্লেষণ অপূর্ব ও অতুলনীয়। কখনও হয়তো এই ধারণা হইয়া থাকিতে পারে যে আমরা শুধু আধ্যাত্মিক চিন্তাই করিয়াছি এবং জীবনের অপরাপর উপাদান সম্পর্কে উদাসীন। একটি অবিবাহিত তরুণ শুধু তাহার মায়ের কথাই ভাবে। কিন্তু বিবাহের পর সে মাতা ও বধূ উভয়ের কথাই চিন্তা করে এবং তাহাদের উভয়ের প্রতিই যথোচিত কর্তব্য পালন করিয়া থাকে। এখন কেহ যদি বলে যে এই ব্যক্তির মায়ের প্রতি ভালবাসা নাই তবে তাহা ঠিক হইবে না। পত্নী প্রথমে শুধু পতিকেই ভালোবাসে কিন্তু সন্তান লাভের পর সে স্বামী এবং সন্তান উভয়কেই ভালবাসে। কখনও কখনও কোনও অবিবেচক স্বামী মনে করে যে স্ত্রী তাহাকে সন্তান লাভের পর অবহেলা করিতেছে। কিন্তু ইহা সত্য নহে, যদি ইহা সত্য হয় তবে বুঝিতে হইবে যে সেখানে বিকৃতি ঘটিয়াছে এবং স্ত্রী তাহার কর্তব্যচ্যুত হইয়াছে।

ঠিক সেইভাবে যখন আমরা আত্মার কথা চিন্তা করা প্রয়োজন মনে করি তখন আমরা শরীরকে অবহেলা করি না। উপনিষদ্ দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করিয়াছে, 'নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্য' অর্থাৎ দুর্বল ব্যক্তি আত্মার উপলব্ধি করিতে পারে না। যে 'শরীর দ্বারাই ধর্ম আচরণ সম্ভব'। আমাদের ও পাশ্চাত্যের চিন্তাধারার মধ্যে প্রধান পার্থক্য এই যে তাহারা শরীর ও তাহার সন্তুষ্টিকেই আদর্শ জ্ঞান করে এবং আমরা শরীরকে আমাদের লক্ষ্যে পৌঁছিবার উপায় মনে করি। আমরা শরীরের উপযোগিতা বলিতে ইহাই বুঝি। আমাদের দৈহিক সন্তুষ্টি সাধনের প্রয়োজন আমরা অবশ্যই অনুভব করি কিন্তু ইহাকেই কর্তব্যের আদর্শ আমার সম্মুখে আছে—শরীরের প্রয়োজন পরিপূরণ, হৃদয়ের প্রসার, বুদ্ধির বিকাশ ও আত্মার উন্নতিসাধন ইহাতেই মানুষ পূর্ণরূপে প্রকটিত হয়। ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চারিটি পুরুষার্থ বা

মানবীয় প্রয়াস। পুরুষার্থ সেই প্রচেষ্টা যাহা মানুষের উপযুক্ত। ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ লাভের আদর্শ মানুষের আজন্ম সংস্কার এবং ইহার পরিপূরণ তাহাকে পরমানন্দ দান করে।

এই চারিটি প্রচেষ্টাকেই আমরা অভিন্নভাবে চিন্তা করিয়াছি। যদিও মোক্ষ এই চারিটি প্রচেষ্টার মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে, তথাপি শুধু মোক্ষলাভের চেষ্টা মানুষের আত্মার পক্ষে কল্যাণকর বলিয়া বিবেচিত হয় নাই। পক্ষান্তরে যে লোক ফলের জন্য ব্যাকুল না হইয়া কর্মে রত থাকে নিশ্চয়ই সে অতি সহজে মোক্ষলাভ করে।

যাহাকে অর্থনৈতিক নীতি বলা হয় তাহা অর্থের আওতায় আসে। প্রাচীন মত অনুযায়ী বিচার ও শাস্তিও ইহার অন্তর্গত। কাম অর্থ বিভিন্ন স্বাভাবিক ইচ্ছার পরিপূরণ, ধর্ম কতকগুলি নীতি ও নিয়মের সমষ্টি, চাহা সামাজিক আচরণ, অর্থ ও কামকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া অভিন্ন ও সুশৃঙ্খল জীবন বিকাশের সহায়ক হয়। ইহার দ্বারা শুধু অর্থ ও সুখই নহে, পরিণামে মোক্ষপ্রাপ্তিও সম্ভবপর হয়।

এইভাবে যদিও ধর্ম অর্থ ও কামকে নিয়ন্ত্রিত করে তথাপি এই তিনটি পুরুষার্থই পরস্পরের সহিত অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত ও পরস্পরের পরিপূরক। ধর্ম লাভে সহায়তা করে। ব্যবসায়েও সততা, সংযম, সত্যবাদিতা ইত্যাদির প্রয়োজন হয় যাহা ধর্মীয় অনুশাসন মাত্র। এই গুণাবলী না থাকিলে মানুষ অর্থ উপার্জন করিতে পারে না। একজন অধর্ম দ্বারা অর্থ উপার্জন করিতে পারে কিন্তু তাহাতে তাহার অর্থ ও কাম (Money and pleasure) প্রাপ্তি ঘটে না। ইহা স্বীকার করিতেই হইবে যে ধর্মই অর্থ ও সুখলাভের উপায়। আমেরিকাবাসীরা ঘোষণা করিয়াছে, Honesty is the best business policy–সততাই শ্রেষ্ঠ ব্যবসায়ীর পদ্ধতি। ইউরোপবাসীরা বলে, Honesty is the best policy– সততাই সর্বশ্রেষ্ঠ উপায়। আমরা আরও এক পদ অগ্রসর হইয়া বলিয়াছি, Honesty is not a policy but a Principal—সততা উপায় বা পদ্ধতি নয়—সততা একটি নীতি বা আদর্শ। আমরা এইজন্য সেই ধর্মে বিশ্বাস করি না যাহা অর্থ উপার্জনের উপায়। আমরা ধর্মে বিশ্বাস করি এইজন্য যে ইহা সভ্য জীবনের মুলনীতি বা আদর্শ।

কাম বা সুখ লাভের একমাত্র উপায় ধর্ম। সুখাদ্য উৎপাদনের পর তাহা কখন, কোথায়, কেমনভাবে ও কি পরিমাণে দেওয়া উচিততাহা একমাত্র ধর্মের দ্বারাই নির্ধারিত হইতে পারে। যদি একজন অসুস্থ ব্যক্তি একজন সবল ব্যক্তির খাদ্য গ্রহণ করে বা একজন সুস্থ ব্যক্তি রোগীর পথ্য আহার করে তবে তাহাতে উভয়েরই অসুবিধা হইতে বাধ্য। ধর্ম মানুষের প্রবৃত্তিকে সংযত করে এবং স্থির করিয়া দেয় যে—ইহা তাহাকে পরিতৃপ্তি দিবে কিনা—ইহা তাহার উপযোগী হইবে কিনা! এই কারণেই ধর্মকে আমাদের সংস্কৃতিতে সর্বোচ্চ স্থান দান করা হইয়াছে।

ধর্ম একান্ত প্রয়োজনীয় ও অপরিহার্য কিন্তু ইহা বিস্মৃত হইলে চলিবে না যে অর্থ ভিন্ন ধর্মাচরণ অসম্ভব। একটি প্রবাদ আছে যে বুভুক্ষ যে, সে সকল প্রকার অন্যায় কার্য করিতে

পারে। বিশ্বামিত্রের মত ঋষিও ক্ষুধার জ্বালায় চণ্ডালের গৃহে চুরি করিয়া কুকুরের মাংস ভক্ষণ করিয়াছিলেন। সুতরাং আমাদের উপদেশ দেওয়া হইয়াছে যে সর্বদা অর্থ উৎপাদন করিতে হইবে, কারণ অর্থই ধর্মকে শক্তিশালী করে। ঠিক এই মতই সরকারকে আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষা করিয়া উশৃঙ্খলতা নিবারণ করিতে হইবে, কারণ উশৃঙ্খলতা ধর্মনাশের কারণ হয়। বিশৃঙ্খলতা অরণ্যের নীতি আনয়ন করে—যেখানে সকলে দুর্বলকে পীড়ন ও শোষণ করে। সুতরাং রাজ্যের স্থায়িত্ব ধর্ম বা আদর্শ রক্ষার জন্য অপরিহার্য। এজন্য শিক্ষা, চরিত্রগঠন, আদর্শের প্রসার এবং উপযুক্ত অর্থনৈতিক ব্যবস্থা একান্ত প্রয়োজনীয়।

সরকারও অর্থের আওতার মধ্যেই আসে। রাজ্যের হস্তে প্রভূত শক্তি কেন্দ্রীভূত হইলে তাহা ধর্মের বা আদর্শের ক্ষতির কারণ হয়। বলা হইয়াছে যে রাজা তাহার প্রজাপুঞ্জের প্রতি অতি কঠোর বা অতিরিক্ত কোমল হইবেন না। অতি কঠোর নীতির ফলে জনমনে বিদ্রোহের ভাব সৃষ্টি হয়। রাজ্য যখন ধর্মের ন্যায়সঙ্গত অধিকার হরণ করে তখন এই বিপদের সম্ভাবনা দেখা দেয়। এই কারণেই অত্যাচারী রাজ্যে ধর্মের অবনতি ঘটে।

যখন রাজ্য রাজনৈতিক ও আর্থিক সমস্ত ক্ষমতা গ্রাস করে তখন তাহার পরিণাম ধর্মের অবসান। এইভাবে যদি রাজ্য অমিত শক্তির অধিকারী হয় তবে সমাজ সবকিছুর জন্য সরকারের মুখাপেক্ষী হয়। রাজ্যের কর্মচারীবৃন্দ তাহাদের কর্তব্যে উদাসীন এবং অন্যায়ভাবে অর্থ আহরণে আগ্রহী হয়। রাজ্যের হস্তে প্রভূত শক্তি কেন্দ্রীভূত হওয়াই এই সকল দুষ্কৃতির কারণ। এইজন্য এই উভয়বিধ উপায়ে অর্থকে প্রাধান্য দেওয়া অনুচিত।

কাম বা সুখ সম্বন্ধেও এইভাবে চিন্তা করিতে হইবে। যদি শারীরিক প্রয়োজন অস্বীকৃত এবং ইচ্ছা সম্পূর্ণ অবদমিত হয় তবে ধর্মের বিকাশ ঘটে না। যদি কেহ অনাহারে থাকে তবে তাহার দ্বারা ধর্ম আচরিত হয় না। যে চারুকলা, যাহা মনকে পরিতৃপ্ত করে, যদি তাহার বিকাশের সুযোগ না থাকে তবে সুসভ্য সমাজ সৃষ্টি সম্ভব হয় না। ইহাতে মানসিক বিকার ঘটে ও ধর্ম অবহেলিত হয়। পক্ষান্তরে যদি রোমের সামন্ততান্ত্রিক লোভ অথবা যযাতির স্পর্শানুসুখের আকাঙ্ক্ষা সমাজে পরিব্যাপ্ত হয় তবে কর্তব্য বিস্মৃত হয়। সুতরাং ধর্মের সহিত সঙ্গতি করিয়া সুখভোগ করিতে হইবে।

আমরা এইভাবে ব্যক্তির জীবন একান্তভাবে বিচার করিয়াছি। আমরা শরীর, মন, বুদ্ধি ও আত্মার সমভাবে বিকাশের আবশ্যকতা উপলব্ধি করিয়াছি। মানুষের নানারূপ আশা ও আকাঙ্ক্ষা পূরণের চেষ্টাকে সংঘর্ষমূলক বলিয়া আমরা অনুভব করি না। ব্যক্তির চার পুরুষার্থ তাহার পূর্ণরূপে বিকশিত হইবার উপায় মাত্র। এই একাত্ম মানবতার বিকাশই আমাদের লক্ষ্য।

ব্যক্তি
সমাজ ও

# ৩ জাতি

ব্যক্তিত্বের বিভিন্ন দিক আছে এবং ব্যক্তির বিভিন্ন প্রকার প্রয়োজন রহিয়াছে। পূর্ণ ব্যক্তিত্ব গড়িয়া তুলিবার জন্য তাহার বিভিন্ন চাহিদা সুষ্ঠুভাবে পূরণের উদ্দেশ্যে সমস্ত স্তরে কতগুলি বিশেষ প্রচেষ্টার প্রয়োজন। ইহা অবশ্যই বিবেচিত হইয়াছে। কিন্তু মানুষ শুধু একক ব্যক্তি নহে। শরীর, মন, বুদ্ধি ও আত্মার দ্বারা গঠিত ব্যক্তি শুধু একটি মাত্র আমি নয়, ইহা সামগ্রিকভাবে 'আমরা'। অতএব আমাদের গোষ্ঠী বা সমাজ সম্বন্ধেও চিন্তা করিতে হইবে।

ইহা অতি সরল সত্য যে সমাজ কতকগুলি ব্যক্তির সমষ্টি। কিন্তু কীভাবে এই সমাজের সৃষ্টি হইল? দার্শনিকেরা এ বিষয়ে বহুমত প্রকাশ করিয়াছেন। পাশ্চাত্যে যে সকল মত প্রচারিত তাহা সংক্ষেপে—'Society is a group of Individuals brought into being by the individuals by among themselves' অর্থাৎ সমাজ কতগুলি সমষ্টি যাহা ব্যক্তিগণের মধ্যে চুক্তির দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই মতে ব্যক্তিকে অত্যাধিক প্রাধান্য দেওয়া হয়। যদি পাশ্চাত্য মতবাদের মধ্যে পার্থক্য থাকে তবে তাহা এই যে যদি ব্যক্তি সমাজ গঠন করিয়া থাকে তবে কাহার হস্তে প্রকৃত ক্ষমতা ন্যস্ত হইবে? ব্যক্তি না সমাজে? ব্যক্তির কি সমাজ পরিবর্তনের অধিকার আছে? সমাজ কি ব্যক্তির উপর বিভিন্ন বিধিনিষেধ আরোপ করিতে পারে? ব্যক্তি এই সকল প্রশ্ন সম্পর্কে সম্পূর্ণ স্বাধীন?

## ব্যক্তি বনাম সমাজ

পাশ্চাত্যে এই প্রশ্নে গুরুতর মতভেদ আছে। কেহ কেহ সমাজকে সর্ব ক্ষমতার অধিকারী বলিয়া মনে করেন এবং ইহা হইতে একটি সঙ্ঘের সৃষ্টি হইয়াছে। প্রকৃত সত্য ইহাই যে ব্যক্তি সমাজের প্রতিষ্ঠা করিয়াছে এই ধারণা ভ্রান্ত। ইহা সত্য যে সমাজ কতগুলি ব্যক্তির সমষ্টি তথাপি ইহা মনুষ্যসৃষ্ট নহে অথবা শুধু কতকগুলি ব্যক্তির পরস্পরের সান্নিধ্যের ফলেও ইহা ঘটে নাই।

আমাদের মতে সমাজ স্বয়ম্ভূ! ব্যক্তির ন্যায় সমাজের প্রতিষ্ঠাও প্রকৃতিগত। মানুষ সমাজ সৃষ্টি করে না। ইহা কোনও কোম্পানি, ক্লাব বা সমবায় সমিতির মত নহে। বাস্তবে সমাজ

একটি আত্মসচেতন সত্তা। ইহা ব্যক্তির ন্যায় সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। ইহা একটি প্রাকৃতিক সত্তা। আমরা একথা কখনও স্বীকার করি নাই যে সমাজ একটি যথেচ্ছ রচিত সংস্থা। ইহার নিজস্ব প্রাণ আছে। সমাজেরও শরীর, মন, বুদ্ধি ও আত্মা বর্তমান। কিছু কিছু পাশ্চাত্য মনস্তত্ত্ববিদ আজকাল এই সত্য স্বীকার করিতেছেন। ম্যাকডুগাল 'গোষ্ঠীমন' (Group mind) নামে একটি মনস্তাত্ত্বিক চিন্তাধারা প্রবর্তন করিয়াছেন। তিনি স্বীকার করিয়াছেন যে গোষ্ঠীর একটি নিজস্ব মন, মনস্তত্ত্ব, চিন্তার ধারা এবং বর্তমান আছে।

গোষ্ঠীর অনুভূতিও রহিয়াছে। ইহা ঠিক ব্যক্তির অনুভূতির মত নহে। গোষ্ঠীর অনুভূতি গণিতের নিয়ম অনুযায়ী কতকগুলি ব্যক্তির সামূহিক শক্তি নহে। একটি গোষ্ঠীর বুদ্ধি, আবেগ, উৎসাহ এবং শক্তি ব্যক্তির গুণাবলী হইতে মূলগতভাবে পৃথক। এই কারণেই অনেক সময় দেখা গিয়েছে যে একজন দুর্বল ব্যক্তি তাহার শারীরিক শক্তির অভাব সত্ত্বেও সমাজের বীরসন্তানরূপে পরিগণিত হইয়াছে। অনেক সময় কোনও ব্যক্তি তাহার ব্যক্তিগত অপমান সহ্য করিলেও গোষ্ঠীর প্রতি অপমান সহ্য করিতে পারে না। অনেক ব্যক্তি তাহার প্রতি ব্যক্তিগত কটূক্তি গ্রাহ্য করিলেও তাহার সমাজের প্রতি কটূক্তি কখনই বরদাস্ত করিবে না। এমনও হইতে পারে যে একজন লোক তাহার ব্যক্তিগত জীবনে অত্যন্ত সৎ হইলেও সমাজের সভ্য হিসাবে সকল প্রকার অপকর্ম করিতে প্রস্তুত। এইরূপে কোনও ব্যক্তি ব্যক্তিগত জীবনে অসৎ কিন্তু সামাজিক জীবনে সৎ হইতে পারেন। ইহা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

আমি আপনাদের একটি উদাহরণ দেব। একবার সর্বোদয় নেতা শ্রী বিনোবাজীর সহিত রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের শ্রী গুরুজীর কথোপকথনকালে একটি প্রশ্ন দেখা দিল যে হিন্দু ও মুসলমান চিন্তাধারার পার্থক্য কোথায়? গুরুজী বিনোবাজীকে বলিলেন যে সকল সমাজেই সৎ ও অসৎ ব্যক্তি বর্তমান। হিন্দু ও মুসলমান সমাজে বহু সৎ ও ভাল লোক আছেন। ঠিক সেইরূপ উভয় সমাজে গুণ্ডা ও বদমায়েসের অভাব নাই। ভালোতে কোনও সমাজেরই একচেটিয়া অধিকার নাই। যাহা হউক, যখন কোনও হিন্দু গুণ্ডা একটি স্থানে সকলের সহিত মিলিত হয় তখন সে ভাল জিনিসই চিন্তা করে। পক্ষান্তরে, যখন দুইজন ভাল মুসলমানও সমাজে একত্র হয় তখন তাহারা এমন সকল প্রস্তাব করে বা এমন বিষয় সমর্থন করে যাহা তাহারা ব্যক্তিগতভাবে কখনই চিন্তাই করিতেন না। ইহা প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতা। বিনোবাজী স্বীকার করেন যে এই অভিমত মূলতঃ সত্য কিন্তু ইহার কারণ তিনি যুক্তি দ্বারা বিশ্লেষণ করিতে পারেন নাই।

এই অবস্থা বিবেচনা করিলে আমরা বুঝিতে পারিব যে ব্যক্তির চিন্তা ধারা এবং সমাজের চিন্তাধারার মধ্যে সর্বদা পার্থক্য রহিয়াছে। এই দুইটির মধ্যে কোনও পাটিগণিতের সম্পর্ক নাই। যদি হাজারটি ভালো লোকও একত্রিত হন তবুও একথা বলা যায় না যে তাহারা ভালো কথাই ভাবিবেন।

আজকাল সাধারণ ভারতীয় ছাত্ররা প্রায়ই নম্র ও লাজুক। গত বিশ বৎসর পূর্বের ছাত্রদের তুলনায় তাহারা কৃশ ও দুর্বলতর। কিন্তু যখন এই ছাত্ররা সমবেত হয় তখন অবস্থা গুরুতর হইয়া দাঁড়ায়। তখন তাহারা নানা প্রকার দায়িত্বহীন কাজে রত হয়। সুতরাং একটি ছাত্র নিয়মানুবর্তী হইতে পারে, কিন্তু একটি ছাত্রদল বিশৃঙ্খল। ইহাকে ব্যক্তিগত মনোভাবের পরিবর্তে Mobmentality নামে অভিহিত করা হয়। এটি জীবনের একটি ক্ষুদ্র দিক।

দার্শনিকতত্ত্ব এই যে একটি জনসমষ্টি একত্রে বহুদিন বসবাস করিলে ঐতিহাসিক পরম্পরা ও সাহচর্যের ফলে তাহারা একইভাবে চিন্তা করিতে আরম্ভ করে এবং একই প্রকার রীতি নীতিতে অভ্যস্ত হইয়া উঠে। ইহা সত্য যে একত্র বসবাসের ফলে কতকটা সাদৃশ্য দেখা দেয়। দুইটি সমমনোভাবাপন্ন ব্যক্তির মধ্যে সখ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু একটি সমাজ বা একটি জাতি শুধু একত্র বসবাসের ফলে গড়িয়া উঠে না।

## কেন অতীতের পরাক্রমী জাতিগুলি বিনষ্ট হইল ?

সকলেই জানেন যে অতীতের বহু জাতির আজ আর কোনও অস্তিত্ব নাই। প্রাচীন গ্রীক জাতি আজ লুপ্ত। মিশরীয় সভ্যতাও সেইভাবেই ধ্বংস প্রাপ্ত। ব্যাবিলন ও সিরিয়ার সভ্যতা আজ অতীতের ইতিহাস। এইভাবে বহু জাতি নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়াছে। এইসকল দেশের নাগরিকেরা কখনও একত্রে বসবাস করিয়াছে এমন ঘটনা তো ঘটে নাই। ইহার একমাত্র কারণ সেখানে জনগণের মধ্যে এমন পার্থক্য সৃষ্টি হইয়াছিল যাহাতে এই সকল জাতি বিনষ্ট হয়।

আলেকজাণ্ডার ও হেরোডেটাস, ইউলিসিস ও এরিস্টোটল, প্লেটো ও সক্রেটিসের জন্মভূমি গ্রীস এবং বর্তমান গ্রীসের অধিবাসীবৃন্দ সেই একই দেশের সন্তান। তাহাদের দেশ কখনও জনশূন্য হয় নাই বা কোনও নূতন জাতিও সেখানে বসবাস করে নাই। বর্তমান গ্রীসের অধিবাসীদের পূর্বপুরুদের সন্ধান করিতে গেলে ২৫০ হইতে ৫০০ পুরুষ অতীতে যাইতে হইবে। তা সত্ত্বেও প্রাচীন গ্রীক জাতি আজ লুপ্ত। এই সকল দেশে নূতন জাতীয়তা গড়িয়া উঠিয়াছে। ইহা কি প্রকারে হইল? একত্র বসবাসের ফলে কোনও জাতি গঠিত হয় না। ইজরাইলের ইহুদীরা হাজার বৎসরের অধিককাল তাহাদের স্বদেশ হইতে বিতারিত হইয়া বাহিরের বিভিন্ন জাতির লোকদের সহিত বসবাস করিয়াও তাহাদের জাতীয় সত্তা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে। অতএব ইহা পরিষ্কার যে জাতীয় প্রেরণার মূল উৎস সমবাসভূমি নহে, অন্য কোনও কিছুতে নিহিত আছে।

## জাতি কাহাকে বলে ?

এর উৎস মানুষের সম্মুখে উপস্থাপিত লক্ষ্যের মধ্যে নিহিত। যখন কোনও জনসমষ্টি একটি লক্ষ্য বা আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইয়া একটি ভূমিখণ্ডকে মাতৃভূমি বলিয়া মনে করে তখন তাহা

একটি জাতিতে পরিণত হয়। শরীরের মধ্যে একটি 'স্ব' বা আত্মা আছে যাহা ব্যক্তির সংক্ষিপ্ত রূপ। শরীরের সহিত আত্মার বিলুপ্তি ঘটিলে মানুষ মৃত বলিয়া পরিগণিত হয়। সেইমত জাতির জীবনেও একটি আদর্শ ও নীতি আছে যাহাকে তাহার আত্মা বলা যাইতে পারে। যদিও মানুষ বারম্বার জন্মগ্রহণ করে বলিয়া বিশ্বাস করা হয় তথাপি নবজাতক একটি পৃথক ব্যক্তি। একই আত্মা এক দেহ ত্যাগ করিয়া অপর দেহ গ্রহণ করে; কিন্তু ইহারা পূর্বে ও পরজন্মের দুইটি পৃথক ব্যক্তি। একটি মানুষের সমাপ্তির অর্থ তাহার শরীর হইতে আত্মার নিষ্ক্রমণ। শরীরের অপরাপর অংশেরও বিশেষ পরিবর্তন ঘটে। জীববিজ্ঞানীরা বলেন যে কয়েক বৎসর পর আমাদের শরীরে নূতন কোষগুলি পুরাতন কোষগুলির স্থলাভিষিক্ত হয়। যেহেতু আত্মা দেহের মধ্যে বিনাবাধায় অবস্থান করে সেই হেতু দেহ বর্তমান থাকে। এই প্রকার সম্পর্ককে দর্শন শাস্ত্রে Law of Identity নামে অভিহিত করা হয়। এই Identity -র জন্য আমরা কোনও বস্তুর উপস্থিতি স্বীকার করি। এই উপলক্ষে নাপিতের ক্ষুরের উপমা সুন্দররূপে বর্ণিত হইয়াছে।

একদিন এক খরিদ্দারের দাড়ি কামাইবার সময় এক নাপিত গর্ব করিয়া বলিতেছিল যে তাহার ক্ষুরটির বয়স ষাট বৎসর। খরিদ্দার বিস্মিত হইয়া প্রশ্ন করিল, "ক্ষুরটির হাতলটি তো খুব চকচকে। তুমি ষাট বৎসর কেমন করে এমন চকচকে করে রাখলে?-নাপিত কৌতুক বোধ করিয়া বলিল, "তাও কি সম্ভব? হাতলটা ছয় মাস পূর্বে বদল করা হয়েছে।"

খরিদ্দার তখন কৌতূহলী হইয়া উঠিয়াছে। সে প্রশ্ন করিল, "ইস্পাতটি কত দিনের?" উত্তর হইল, "তিন বৎসর পূর্বের।" অর্থাৎ হাতল বদলাইয়াছে, ইস্পাত বদলাইয়াছে, কিন্তু ক্ষুরের পরিচয় বদলায় নাই। ঠিক সেইরকম প্রত্যেক জাতিরও একটি আত্মা আছে। ইহার একটি বিশিষ্ট নাম আছে। জনসঙ্ঘ যে 'সিদ্ধান্ত ও নীতি' গ্রহণ করিয়াছে তাহাতে উল্লেখ আছে—ইহার নাম 'চিতি'। ম্যাকপড্রালের ভাষায়, "It is an innate nature of a group" —ইহা একটি গোষ্ঠীর নিজস্ব প্রকৃতি। তাই সকল সমাজেরই একটি নিজস্ব প্রকৃতি বর্তমান—যাহা ঐতিহাসিক ঘটনার পরিণতি নয়।

একটি মানুষ একটি আত্মা লইয়া জন্মগ্রহণ করেন। ব্যক্তিত্ব, আত্মা ও চরিত্র প্রত্যেকটি পৃথক পৃথক ভাবে স্পষ্ট। ব্যক্তির সকল কর্ম, চিন্তা এবং অনুভূতি দ্বারা ব্যক্তিত্ব গঠিত হয়। সেইমত জাতীয় সংস্কৃতি ঐতিহাসিক কারণে ক্রমাগত পরিবর্তিত হইতে থাকে। সমবাসভূমি, সমপ্রচেষ্টা ও সমইতিহাস ক্রমশ উন্নততম ব্যবস্থা প্রবর্তন করিতে পারে কিন্তু চিতি বা সমাজ চৈতন্যের উপর ইহার কোনও প্রভাব থাকে না। এই চৈতন্যময় চেতনাই জাতিকে প্রকৃত সাংস্কৃতিক বিকাশের পথে পরিচালিত করে।

## চিতি-সংস্কৃতি-ধর্ম

উদাহরণ হিসাবে মহাভারতের কাহিনীর কথা বিবেচনা করা যাইতে পারে। কৌরবদের পরাজয় এবং পাণ্ডবদের জয় হইয়াছিল। আমরা কেন পাণ্ডবদের আচরণ ধর্মীয় মনে করি? কেন এই যুদ্ধকে শুধু রাজ্য লাভের জন্য যুদ্ধ মনে করি না? যুধিষ্ঠিরের প্রশংসা এবং দুর্যোধনের নিন্দা কোনও রাজনৈতিক কারণে হয় নাই। কৃষ্ণও তাঁহার মাতুল কংসকে হত্যা করিয়াছিলেন। কংস তখন রাজা ছিলেন। ইহাকে বিদ্রোহ আখ্যা না দিয়া কেন আমরা কৃষ্ণকে অবতার এবং কংসকে অসুর নামে অভিহিত করিয়াছি?

রাম তাঁহার লঙ্কা অভিযানে রাবণের ভ্রাতা বিভীষণের সাহায্য লাভ করিয়াছিলেন। বিভীষণের আচরণকে দেশদ্রোহী না বলিয়া সৎ ও আদর্শ বলা হইল কেন? বিভীষণ তাহার ভ্রাতা এবং দেশের রাজার প্রতি জয়চাঁদের মত বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াও কেন প্রশংসিত হইয়াছিলেন? ইহার মূলেও কোনও রাজনৈতিক কারণ নাই।

কোনও কার্যের ভালো বা মন্দ বিচারের একমাত্র মাপকাঠি চিতি বা সমাজ চেতনা। প্রকৃতির যে গুণাবলী সমাজের পক্ষে উপকারী তাহা সংস্কৃতিতে যুক্ত হয়। আবার সমাজ চেতনা কল্যাণকর বিবেচিত না হইলে তাহা পরিহার করিতে হয়। সমাজ চেতনা বা চিতি হইল কষ্টিপাথরের মত যাহাতে ঘসিয়া ভালো ও মন্দ নির্ধারিত হয়। এই চিতি বা চৈতন্যের দ্বারা জাতির অভ্যুত্থান ঘটে। সকল জাতির মহান সন্তানদের মধ্যে এই চৈতন্যের বিকাশ ও তদনুযায়ী তাঁহাদের কার্য করিতে দেখা যায়।

ব্যক্তিও অনেক সময় জাতির চৈতন্য জাগ্রত করার কারণ হয়। এইভাবে ব্যক্তি তাহার নিজস্ব সত্তা ব্যতীত জাতিরও প্রতিনিধিত্ব করিয়া থাকে। শুধু তাহাই নহে, জাতীয় লক্ষ্যে উপনীত হইবার জন্য যে সকল সংস্থা গড়িয়া ওঠে, ব্যক্তি তাহারও পরিচালক। জাতি অপেক্ষাও বৃহৎ মানব সমাজেরও সে প্রতিনিধি। সংক্ষেপে বলিতে গেলে ব্যক্তির বহু দিক আছে কিন্তু তাহা সংঘর্ষমূলক নহে। ঐক্য ও সামঞ্জস্যের আদর্শ সর্বদা তাহাকে প্রেরণা জাগাইতেছে। একটি ব্যবস্থা যাহার মূলে প্রকৃতির পারস্পরিক সহযোগিতা-প্রবৃত্তি যাহা মানব সমাজের বিভিন্ন আদর্শের সামঞ্জস্য সাধন করে।

## প্রতিষ্ঠান জাতীয় আশা পূরণের উপায়

ডারউইনের মতে জীবমাত্রেরই বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অবস্থা অনুযায়ী গড়িয়া উঠে। আমাদের শাস্ত্রে ইহা একটু অন্যভাবে বলা হইয়াছে যে, আত্মা প্রাণের সাহায্যে জীবনধারা অব্যাহত রাখার প্রয়োজনে বিভিন্ন ইন্দ্রিয় গঠন করে। যেমন আত্মা এইসকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ রচনা করে তেমনই জাতির লক্ষ্য পূরণের জন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠে। একটি শিল্প বা কারখানার জন্য যেমন গৃহ, যন্ত্রপাতি বিক্রয় ও উৎপাদন কেন্দ্র এবং ইহা অব্যাহত রাখার জন্য বিভাগ

সৃষ্টি হয় তেমনিই জাতির অগ্রগতি ও অস্তিত্ব রক্ষার জন্যও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান রচিত হয়। পরিবার, বর্ণ, গোষ্ঠী (যাহাকে আজ ট্রেড ইউনিয়ন বলা হয়) এই প্রকার প্রতিষ্ঠান। সম্প্রতি বিবাহ ইত্যাদিও তাহাই। পূর্বে বিবাহ ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল না। পরে কোনও ঋষি বিবাহ প্রথা প্রবর্তন করেন। গুরুকুল ও ঋষিকুল এই প্রকার প্রতিষ্ঠান। ঠিক এই প্রকারের রাজ্যও একটি প্রতিষ্ঠান। জাতি ইহা গঠন করে। পশ্চিমে জাতি ও রাজ্য এক বলিয়া ধরিয়া লওয়ার ফলে নানান সমস্যার সৃষ্টি হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে জাতি (Nation) ও রাজ্য (State) এক নহে। পূর্বে সমাজে কোনও রাজা ছিল না। ধর্ম আচরণের মাধ্যমে পরস্পর পরস্পরকে রক্ষা করিতেন।

পরবর্তীকালে বাধা ও বিপত্তি দেখা দেয়। লোভ এবং ক্রোধ প্রাধান্য লাভ করে। ধর্মের পতন ঘটিতে থাকে এবং 'জোর যার মুলুক তার' বা মাৎস্যন্যায়ের উদ্ভব হয়। ঋষিরা এই অবস্থা দেখিয়া শঙ্কিত হন। তাঁহারা সকলে ব্রহ্মার নিকট উপদেশের জন্য উপস্থিত হইলেন। ব্রহ্মা তাঁহাদের নিকট রাজ্যের নিয়ম ও পরিচালন ব্যবস্থা বর্ণনা করেন। ইহা তাঁহার স্বরচিত।এই সময় তিনি মনুকে প্রথম নৃপতির পদ গ্রহণের আদেশ দেন। মনু ইহাতে অস্বীকৃত হন এই কারণে যে রাজা হইলে অন্যান্য অপরাধী ব্যক্তিকে শাস্তি দিতে হইবে। তাহাদের কারাগারে আবদ্ধ রাখিতে হইবে এবং ইহাতে তাঁহার পাপ হইবে। তখন ব্রহ্মা বলিলেন যে রাজা হিসাবে সমাজের শৃঙ্খলা রক্ষা ও শান্তি স্থাপনের জন্য ধর্মানুযায়ী কর্তব্য করিলে তাঁহার কোনও পাপ হইবে না। ইহা তাঁহার কর্তব্য বা ধর্ম বলিয়া পরিগণিত হইবে। শুধু তাহাই নহে, তাঁহার প্রজাবর্গ যদি ধর্ম করে তবে তাহাদের সুকর্মের ফলও তাঁহার প্রাপ্য হইবে। যদিও ইহা স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয় নাই তথাপি আমার বিশ্বাস যে যদি কোনও রাজা পাপাচরণ করে বা সমাজে পাপকার্য অনুষ্ঠিত হয় তবে তাহার পরিণামও রাজাকে সমানভাবে ভোগ করিতে হইবে। শুধু সুকর্মের ফলে রাজার অংশ থাকিবে কিন্তু দুষ্কর্মের ফল ভোগ করিতে হইবে না ইহা হইতে পারে না। উভয়ই সমানভাবে ভোগ করিতে হইতে। এইরূপ চুক্তি রাজ্যের প্রতি প্রযোজ্য কিন্তু জাতির (Nation) প্রতি নহে। পশ্চিমে ইহার অবস্থা বিপরীত। তাহাদের মতে সমাজ জাতিরূপে একটি চুক্তি কিন্তু রাজা স্বর্গীয় অধিকার দাবি করিতে পারে এবং ভগবানের একমাত্র প্রতিনিধি পদে নিজেকে ঘোষণা করিতে পারে। ইহা ভুল। আমাদের দেশে রাজপ্রথা অতি প্রাচীন হইতে পারে কিন্তু সমাজ বা জাতি স্বয়ম্ভুত। রাজ্য জাতির স্বার্থে গঠিত একটি প্রতিষ্ঠান মাত্র। ঠিক এইভাবেই রাষ্ট্রের মত বিভিন্ন সংস্থা গড়িয়া উঠিয়াছে। প্রত্যেকটি ব্যক্তি এই সকল সংস্থার অঙ্গ বিশেষ। এক ব্যক্তি তাহার পরিবারের বা গোষ্ঠীর সদস্য। সে পেশায় আরও কোনও প্রতিষ্টানের সদস্য হইতে পারে। তদুপরি সে তাহার জাতি বা সমাজের সদস্য। আরও বড় করিয়া দেখিলে সে সমগ্র মানব বা বিশ্বের সদস্য। প্রকৃতপক্ষে ব্যক্তির কোনও একক অস্তিত্ব নাই। ব্যক্তি সর্বদাই বহু। সে অনেক প্রকার জীবনযাপন করে। সর্বাপেক্ষা বড় কথা এই যে তাহার বিভিন্ন ব্যক্তিত্ব সত্ত্বেও কাহারও সহিত তাহার সংঘাত নাই। তাহাকে

এমনভাবে চলিতে হয় যাহাতে সে পরস্পরের পরিপূরক ও রচনাত্মক কার্যে ব্রতী হয়, বিচ্ছেদ বা অহিতকর কার্য করে না—এই গুণ মানুষের জন্মগত।

যে ব্যক্তি এই গুণের উপযুক্ত প্রয়োগ করিতে সক্ষম সেই সুখী এবং যে তাহা করিতে পারে না সেই অসুখী হয়। এইরূপ ব্যক্তির জীবনের স্বাভাবিক বিকাশ ঘটে না। উদাহরণ স্বরূপ, এক ব্যক্তি তাহার মাতার পুত্র, পত্নীর পতি; ভগ্নীর ভ্রাতা এবং পুত্রের পিতা। একই ব্যক্তি পুত্র ও পিতা, পতি ও ভ্রাতা। তাহাকে সকলের সহিত সম্পর্ক অনুযায়ী সুষ্ঠু আচরণ করিতে হয়। যখন কোনও ব্যক্তি তাহা করিতে পারে না তখনই সংঘাত ঘটে। যদি সে একজনকে সমর্থন করে তবে অপরে ক্ষুব্ধ হয়। তাহার পত্নীর সহিত ভগ্নীর, পত্নীর সহিত মাতার সংঘর্ষ তাহার ভ্রান্ত আচরণের জন্যই ঘটিয়া থাকে। তাহাদের মধ্যে মন কষাকষি চলিতে থাকে। ব্যক্তি তখন ব্যথিত হয়, কারণ তাহার মাতা ও পত্নীর প্রতি কর্তব্য ঠিকমত স্বীকৃত হয় না। যখন সে এই সংঘাতের অবসান ঘটাইয়া তাহার কর্তব্য সুষ্ঠুভাবে পালন করিতে সক্ষম হয় তখন সমগ্র পরিবারের সহিত তাহার একাত্মভাব বৃদ্ধি পায় এবং সে সার্থকতা লাভ করে

## ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে সংঘাত নাই

আমরা একথা মানিয়া লইতে পারি না যে ব্যক্তির বিভিন্ন ব্যক্তিত্বের সহিত সমাজের বিভিন্ন সংস্থার চিরন্তন সংঘাত অবশ্যম্ভাবী। যদি কোনও বিবাদ দেখা দেয় তবে বুঝিতে হইবে যে সেখানে বিকৃতি আছে—ইহা প্রকৃতি বা সংস্কৃতি নহে। পাশ্চাত্যের চিন্তাধারার এই খানেই ভ্রান্তি। তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই মনে করেন যে মানবের অগ্রগতির ইতিহাস শুধু সংঘর্ষের ইতিহাস। এই কারণেই তাঁহারা ব্যক্তি ও রাজ্যের মধ্যে সংঘর্ষ স্বাভাবিক ঘটনা বলিয়া বিশ্বাস করে। ঠিক এই ধারণা হইতেই শ্রেণী সংঘর্ষের চিন্তা উদ্ভূত হইয়াছে।

প্রত্যেক সমাজেই শ্রেণীর অস্তিত্ব থাকে। আমাদের দেশেও বিভিন্ন বর্ণ ছিল। কিন্তু আমরা কখনও কোনও বর্ণের সহিত অপর বর্ণের সংঘাতকে মূলগত বা স্বাভাবিক বলিয়া বিশ্বাস করি নাই। আমাদের চতুর্বর্ণের আদর্শের মধ্যে সেই বিরাট পুরুষের বিভিন্ন অঙ্গের মধ্যে কোনও সংঘাত ঘটিতে পারে কি? যদি সংঘাত স্বাভাবিক হইত তবে দেহ কখনই টিকিয়া থাকিত না। এই অঙ্গগুলি শুধু একটি অপরের সাহায্যকারীই নয়, ইহা একাঙ্গ এবং অখণ্ডত্বের প্রতীক। বর্ণ সৃষ্টির সময় এই ভাবেই চিন্তা করা হইয়াছিল। বিভিন্ন বর্ণের মধ্যে সংঘাত স্বাভাবিক নহে, ইহা প্রকৃতি বিকৃতি।

সমাজের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের অবনতি বিভিন্ন কারণে ঘটিয়া থাকে। সমাজের আত্মা দুর্বল হইলে সমাজের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান দুর্বল এবং নিষ্ক্রিয় হইয়া পড়ে। কোনও একটি বিশেষ প্রতিষ্ঠান কখনও অকর্মণ্য এমনকী অহিতকর হইতেও পারে। আবার কখনও কোনও বিশেষ

প্রতিষ্ঠান স্থান, কাল ও পরিবেশ অনুযায়ী অধিকতর কার্যকরীরূপে গড়িয়া উঠিতে পারে। এই সকল প্রতিষ্ঠানের বর্তমান অবস্থা বিবেচনা করিলে ইহার প্রকৃত কার্যকারিতা উপলব্ধি করা যাইবে। কিন্তু এই বিচারের সময় উদার ও সহনশীল হইতে হইবে। এইজন্য পরস্পর বিরোধী না হইয়া সহযোগিতার আদর্শ গ্রহণ করিতে হইবে।

রাজ্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে একটি বিশিষ্ট বা প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠান। কিন্তু ইহা সর্বোপরি নহে। আধুনিক জগতে বৃহৎ সমস্যার মূল কারণ এই যে, প্রায় সকলেই রাজ্য ও সমাজকে এক বলিয়া মনে করে (অন্ততঃ কার্যত রাজ্যকে সমাজের একমাত্র প্রতিনিধি বলিয়া মনে করা হয়)। রাজ্য এত অধিক ক্ষমতাসম্পন্ন হইয়াছে যে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলির অবনতি ঘটিয়াছে এবং তাহাদের কার্য্যক্ষমতা প্রায় লোপ পাইতে বসিয়াছে।

আমরা কখনই রাজ্যকে সমাজের একমাত্র প্রতিনিধি বলিয়া স্বীকার করি নাই। আমাদের রাজ্য বিদেশীর পদানত হওয়ার পরেও আমাদের জাতীয় জীবন অব্যাহত গতিতে চলিয়াছে। স্বাধীনতা লোপ পাইবার সঙ্গে সঙ্গে পারসিক জাতির অস্তিত্ব লুপ্ত হইয়াছে। কিন্তু আমাদের দেশের বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন বৈদেশিক শাসন বর্তমান ছিল। পাঠানেরা দিল্লীর সিংহাসন দখল করে। তাহাদের পরে আসে তুর্কি, মোগল ও ইংরেজরা। এতদ্‌সত্ত্বেও আমাদের জাতীয় জীবনধারা লুপ্ত হয় নাই। কারণ রাজ্য আমাদের সমাজের জীবনকেন্দ্র ছিল না। যদি রাজ্যকে আমরা প্রধান বলিয়া গণ্য করিতাম তবে বহু পূর্বেই আমাদের জাতীয় অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইত। শিশুদের জন্য রচিত কাহিনীতে বলা হয় যে, দৈত্যের প্রাণ তোতাপাখির মধ্যে থাকে এবং দৈত্যকে বধ করিতে হইলে পাখিটিকে বধ করিতে হইবে। যে সকল জাতির প্রাণ রাজ্যের মধ্যে নিহিত ছিল, রাজ্যনাশের সঙ্গে সঙ্গে সেই সকল জাতি ধ্বংস হইয়াছে। পক্ষান্তরে যে সকল জাতি রাজ্যকে তাহার জীবনকেন্দ্র বলিয়া বিশ্বাস করে নাই সেই সকল জাতি তাহার রাজনৈতিক শক্তি হস্তান্তরিত হইবার পরেও বিনষ্ট হয় নাই।

ইহার একটি খারাপ ফলও ছিল। ড. আম্বেদকর বলিয়াছেন যে, আমাদের গ্রাম পঞ্চায়েতগুলি এত শক্তিশালী ছিল যে আমরা দিল্লীর সিংহাসনকেও উপেক্ষা করিয়াছি। আমরা রাজ্য সম্পর্কে সতর্ক ছিলাম না, কারণ আমরা মনে করিতাম যে রাজ্যের উপর জাতির জীবন নির্ভর করে না। কিন্তু আমাদের ঐ ভুল হইয়াছিল যে যদিও রাজ্যের স্থান সর্বোপরি না হইতে পারে, কিন্তু ইহা প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠান তাহা আমরা বিস্মৃত হইয়াছিলাম।

এই কারণেই শিবাজীর গুরু রামদাস স্বামী তাহাকে রাজ্য স্থাপনের আদেশ দেন। ধর্মের নিজস্ব শক্তি আছে; ধর্ম জীবনে অত্যাবশ্যক। শ্রীরামদাসও শিবাজীকে সন্ন্যাস লইয়া ধর্মপ্রচারে ব্রতী করিতে পারিতেন, কিন্তু তিনি তাহা না করিয়া তাহাকে শাসন প্রতিষ্ঠার আদেশ দেন। কারণ রাজ্য সমাজের একটি প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠান। কিন্তু কোনও কিছুর প্রয়োজনীয়তা বোধ করা এক কথা এবং তাহা সর্বোপরি বলিয়া স্বীকার করা আর এক কথা। এখন প্রশ্ন হইতে

পারে, যদি রাজ্য সর্বোচ্চ না হয় তবে সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় কি? আমাদের এবার এই প্রশ্ন বিবেচনা করিতে হইবে।

## ধর্ম সমাজকে রক্ষা করে

রাজ্যের প্রতিষ্ঠা কেন হইয়াছিল এই প্রশ্ন আমাদের বিবেচনা করিতে হইবে। একথা কেহই অস্বীকার করিবেন না যে রাজ্যের অবশ্যই কোনও উদ্দেশ্য বা আদর্শ আছে। তাহা হইলে এই উদ্দেশ্য বা আদর্শকেই সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় বলিয়া বিবেচনা করিতে হইবে। কোষাগারের প্রহরীকে কখনই রক্ষিত সম্পদ অপেক্ষা অধিক গুরুত্ব দেওয়া যায় না। সে প্রহরীমাত্র। রাজ্যও নির্মিত হয় জাতি বা সমাজকে রক্ষার জন্য। রাজ্যের উপর উৎপাদন ও সংরক্ষণের দায়িত্ব অর্পিত হইয়াছিল যাহাতে জাতির আদর্শ বাস্তবে রূপায়িত হইতে পারে। জাতির আদর্শকে চৈতন্য বা 'চিতি' নামে অভিহিত করা হয়—যাহা ব্যক্তির আত্মার সহিত তুলনীয়। সে সকল নীতি একটি জাতির চৈতন্য বজায় রাখার জন্য প্রয়োজন হয় তাহারই নাম ধর্ম। সুতরাং ধর্মের স্থান সর্বোচ্চ। ধর্ম জাতির আত্মাকে রক্ষা করে। ধর্ম নষ্ট হইলে জাতি বিনষ্ট হয়। যে ধর্ম পরিহার করে, যে জাতির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে।

ধর্ম মন্দির বা মসজিদে আবদ্ধ থাকে না। ভগবানের উপাসনা ধর্মের একটি অঙ্গ মাত্র। ধর্ম আরও বৃহৎ। বিদ্যালয় মানে যেমন জ্ঞান নয়, তেমন মন্দিরও ধর্ম নয়। একটি শিশু নিয়মিত বিদ্যালয়ে যাইয়াও অশিক্ষিত থাকিতে পারে, সেই প্রকার কোনও মন্দির বা মসজিদে নিয়মিত যাতায়াত করিলেও ধর্ম সম্বন্ধে অজ্ঞ হইতে পারে। ইংরাজিতে বহু ভ্রান্ত অনুবাদের মত ধর্মকে 'রিলিজিয়ন' বলিয়া বর্ণনা করার ফলে অত্যন্ত অহিতকর বিভ্রান্তির সৃষ্টি হইয়াছে।

## ধর্ম ও রিলিজিয়ন পৃথক

আমরা একদিকে ধর্মকে রিলিজিয়ন নামে অভিহিত করিয়াছি, অপরদিকে ক্রমবর্ধমান অজ্ঞানতা দ্বারা আমাদের নিজেদের সমাজ ও ধর্মের প্রতি অবহেলা করিয়াছি। পাশ্চাত্যের জীবনপদ্ধতি গ্রহণের অভিলাষই ইংরাজি শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। ফলে পাশ্চাত্যের সঙ্কীর্ণ রিলিজিয়নের আদর্শকেই ধর্ম নামে অভিহিত করা হইল। যেহেতু পাশ্চাত্য দেশগুলিতে এই তথাকথিত রিলিজিয়নের নামে অন্যায় পীড়ন, সংঘর্ষ এবং সংগ্রাম হইয়াছে, সুতরাং অনেকেই এইগুলিকে ধর্মের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্ত হিসাবে গ্রহণ করিয়াছে। আমরাও অনুভব করিয়াছি যে ধর্মের নামে যুদ্ধবিগ্রহ হইয়াছে। কিন্তু রিলিজিয়নের নামে যুদ্ধ ও ধর্মযুদ্ধের মধ্যে পার্থক্য আছে। রিলিজিয়নের অর্থ একটি মত, বিশ্বাস বা সম্প্রদায়। ইহার অর্থ ধর্ম নহে। ধর্মের অর্থ ব্যাপক। ইহা জীবনের সকল বিভাগের সহিত জড়িত। ইহা সমাজকে রক্ষা করে—বিশ্বকে রক্ষা করে।

কতকগুলি নীতি অস্থায়ী এবং কতকগুলি অধিক কালের জন্য নির্দিষ্ট। কোনও সভায় আচরণেরও নীতি আছে। একটি নীতি এই যে আমি বলিলে আপনারা মনযোগ দিয়া শ্রবণ করিবেন। যদি এই নীতি বিস্মৃত হইয়া আপনারা পরস্পরের সহিত কথা বলিতে থাকেন তাহা হইলে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হইবে। আমাদের সভার কার্য অগ্রসর হইবে না। সেক্ষেত্রে বলা হইবে যে আপনারা ধর্ম আচরণ করেন নাই। কিন্তু এই নীতি সভাস্থলেই সীমাবদ্ধ। কিন্তু যদি সভার শেষে গৃহে গমন করিয়াও কথাবার্তা না বলেন তবে আপনার পরিবারবর্গ ডাক্তার ডাকিতে ছুটিবে। সুতরাং সভায় সভার নীতি এবং গৃহের নীতি পালন করিতে হইবে। বিভিন্ন নীতি সম্পর্কে আলোচনা এবং তাহার দার্শনিক ভিত্তি এমন হওয়া উচিত যাহাতে ইহা ধর্মের বৃহত্তর রূপরেখার সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়। উদাহরণস্বরূপ, যখন আমরা একটি রেজিষ্টার্ড সোসাইটি গঠন করি, তখন তাহার আইন কানুন প্রণয়নের অধিকার অবশ্যই আমাদের থাকে। কিন্তু তাহা উক্ত সোসাইটির গঠনতন্ত্রের পরিপন্থী হওয়া চলিবে না। উক্ত গঠনতন্ত্রও কিন্তু সোসাইটি রেজিস্ট্রেশন অ্যাক্ট অনুযায়ী হইতে হইবে। আবার উক্ত রেজিস্ট্রেশন অ্যাক্ট দেশের সাধারণ সংবিধানের অনুবর্তী হইতে হইবে। এককথায় দেশের সংবিধান একটি মূল দলিল, যাহা দ্বারা দেশের সকল আইনকানুন প্রণয়ন ও নিয়ন্ত্রিত হয়। জার্মানিতে সংবিধানের নাম মূল আইন (Basic Law)। সংবিধান কি কোনও নীতির অধীন নয়? চিন্তা করিলে দেখা যাইবে যে সংবিধানকে কতকগুলি স্বাভাবিক নীতি মানিয়া চলিতে হয়। সংবিধান জাতির উন্নতির জন্য রচিত। যদি দেখা যায় যে ইহার ফলে ক্ষতি হইতেছে তবে তাহা সংশোধন করিতে হয়। এই সংশোধনও শুধু সংখ্যাগরিষ্ঠের মতের উপর নির্ভরশীল নয়। মেজরিটি কি সব করিতে পারে? সব সময় কি তাহাদের সিদ্ধান্ত ন্যায়সঙ্গত হয়? না, তাহা হয় না। পাশ্চাত্যে একসময় রাজাকে সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী বলিয়া মান্য করা হইত। ইহার পর রাজন্যপ্রথা বাতিল হইলে জনগণকে সর্বশক্তিমান বলিয়া ঘোষণা করা হইল। আমাদের দেশে কখনও রাজা, জনগণ ও পার্লামেন্ট সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী ছিল না। পার্লামেন্টও যথেষ্ট আইন প্রণয়ন করিতে পারে না।

ব্রিটিশ পার্লামেন্ট সম্বন্ধে বলা হয় যে ইহা যাহা ইচ্ছা করিতে পারে। শুধু নারীকে পুরুষ বা পুরুষকে নারী করিতে পারে না। কিন্তু পার্লামেন্ট কি এই আইন করিতে পারে যে সকল ইংরেজকে মাথা দিয়া হাঁটিতে হইবে? ইহা অসম্ভব। ইংলন্ডে কি এমন আইন রচিত হইতে পারে যাহাতে প্রত্যেককে স্থানীয় কর্তৃপক্ষের নিকট নিত্য হাজিরা দিতে হইবে? পারে না, তাহারা পরস্পরকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করে। কিন্তু তাহাদের পরম্পরারও বহু পরিবর্তন হইয়াছে। যখন কোনও রীতি ইংলণ্ডের উন্নতির বাধাস্বরূপ মনে হইয়াছে তাহা তখনই পরিত্যক্ত হইয়াছে ও যে নীতিগুলি উন্নতির সহায়ক তাহা সংযোজিত হইয়াছে।

ইংলণ্ডের মত পরম্পরাকে (Tradition) সর্বত্র শ্রদ্ধা করা হয়। আমাদের লিখিত সংবিধান আছে কিন্তু তাহাও দেশের ঐতিহ্য বিরোধী হইতে পারে না। যদি ইহা আমাদের ঐতিহ্যের পরিপন্থী হয় তবে তাহা ধর্মের আদর্শ পূরণ করে না। যে সংবিধান জাতির উন্নতিবিধান করে তাহাই ধর্মের অনুকূল। এইভাবে আমরা ধর্মকেই সর্বোচ্চ স্থান দিয়াছি এবং ধর্মই সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। অন্য সকল সংস্থা, ব্যক্তি বা শাসকবৃন্দ ধর্ম হইতে শক্তি সংগ্রহ করেন এবং তাহা ধর্মের অনুবর্তী হইতে বাধ্য।

যদি আমরা আমাদের সংবিধানকে জাতীয় বিকাশের দিক হইতে বিবেচনা করি তবে ইহা সংশোধনের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হইবে। আমরা এক জাতি এক সমাজ। এইজন্য আমরা ভাষা, প্রদেশ, বর্ণ, মতবাদ বা তথাকথিত রিলিজিয়নের ভিত্তিতে কাহারও বিশেষ অধিকার স্বীকার করি না—সকলকে সমান মর্যাদা দিই। আমরা সকলেই ভারতের নাগরিক। পৃথক পৃথক প্রদেশ আছে কিন্তু কেন্দ্রীয় বা প্রাদেশিক নাগরিকত্ব বলিয়া কিছু নাই। এই নীতিতেই আমরা কোনও প্রদেশের পৃথকীকরণের অধিকার অস্বীকার করিয়াছি। শুধু তাহাই নহে, রাজ্যের সীমান্ত চিহ্নিতকরণ এবং তাহার নামকরণের অধিকারও পার্লামেন্টের উপরই ন্যস্ত। কোনও বিধানসভার এ ক্ষমতা নাই। এই ব্যবস্থা ভারতের ঐতিহ্য ও জাতীয় আদর্শের অনুযায়ী। কিন্তু এতদ্সত্ত্বেও আমরা আমাদের সংবিধানকে যুক্তরাষ্ট্রীয় রূপ দিতে চেষ্টা করিয়াছি। ফলে আমরা যাহা নীতি হিসাবে গ্রহণ করিয়াছি কার্যত তাহা বর্জন করিতে উদ্যত হইয়াছি। যুক্তরাষ্ট্রে বিভিন্ন রাজ্যের স্বেচ্ছায় যোগদানের নীতি স্বীকৃত এবং ইচ্ছা হইলেই বাহির হইয়া যাওয়ার অধিকার থাকে। ইহা ভারতের ঐক্য ও অখণ্ডত্বের আদর্শ বিরোধী। ইহাতে ভারতমাতার পবিত্র আদর্শ যাহা জনমনে বিরাজিত তাহা প্রকাশিত হয় না। আমাদের সংবিধানের প্রথমেই লেখা হইয়াছে—"India i.e. Bharat will be a Federation of States" অর্থাৎ ইণ্ডিয়া বা ভারত বিভিন্ন রাজ্য সমন্বিত যুক্তরাষ্ট্র। তাহা হইলে বিহার মাতা, বঙ্গমাতা, পাঞ্জাব মাতা, কানাড়া মাতা, তামিল মাতা প্রভৃতি সকল মাতার সমষ্টি ভারত-মাতা। ইহা হাস্যকর। আমরা প্রদেশগুলিকে এক ভারতমাতার অঙ্গ বলিয়া চিন্তা করি। সুতরাং আমাদের সংবিধানে যুক্তরাষ্ট্রের পরিবর্তে এক ভারতরাষ্ট্রের কথা বলা উচিত ছিল।

অখণ্ড রাষ্ট্রের অর্থ এই নয় যে সমস্ত ক্ষমতা কেন্দ্রের করায়ত্ত থাকিবে। একটি পরিবারের কর্তার হস্তে সমস্ত ক্ষমতা থাকে না। কিন্তু তাহার নামেই সমস্ত কাজ হয়। অন্যান্যদের হস্তেও কার্যকরী ক্ষমতা থাকে। আমাদের শরীরের কথাই ধরা যাক। সমস্ত শক্তি কি আত্মার নিকট কেন্দ্রীভূত হয়? সুতরাং অখণ্ড রাষ্ট্রের অর্থ এই নয় যে তাহা যথেচ্ছ ব্যবহার করিবে। প্রদেশগুলিরও বিভিন্ন শাসন ক্ষমতার অধিকার থাকিবে। এমন কি প্রদেশের নীচে জনপদগুলিরও উপযুক্ত ক্ষমতা থাকিবে। শুধু তাহাই নহে, পঞ্চায়েতগুলি একটি বিশেষ গুরুত্ব লাভ করিয়াছিল। কেহ পঞ্চায়েত প্রথা নষ্ট করিতে পারে নাই। আজকাল আমাদের সংবিধানে কিন্তু

পঞ্চায়েতের কোনও স্থান নাই। পঞ্চায়েতের হস্তে প্রকৃতপক্ষে কোনও ক্ষমতাই দেওয়া হয় নাই এবং এগুলির নিজস্ব অস্তিত্বও প্রাদেশিক সরকারের উপর নির্ভরশীল। তাহাদের উপযুক্ত ক্ষমতা দান গণতন্ত্রের ভিত্তি সুদৃঢ় করিবে। এইভাবে শক্তির বিকেন্দ্রীকরণ সম্ভব। পক্ষান্তরে এই সকল প্রতিষ্ঠান ও তাহাদের ক্ষমতা অখণ্ড রাষ্ট্রের কল্যাণ সাধনে নিযুক্ত থাকিবে। এই ব্যবস্থাতেই ধর্ম সুষ্ঠু রূপে আচরিত হইবে।

ধর্মের এই সংজ্ঞা শুধু জাতি ও রাষ্ট্র নহে, সমগ্র মানব প্রকৃতি বিশ্লেষণে ব্যবহৃত হইতে পারে। এক কথায় একটি জাতির সংবিধান প্রাকৃতিক নীতির বিরুদ্ধাচারী হইতে পারে না। এমন কতগুলি আচরণবিধি আছে যাহা কোনও আইনের পুস্তকে বা সংবিধানে লেখা থাকে না। তথাপি পিতাকে ভক্তি করা হয়, যাহারা তাহা করে না তাহাদের নিন্দা করা হয়। কোনও বিচারকালে আইনে লেখা না থাকিলেও বিচারক এই রায় দিলেন যে সাবালক না হওয়া পর্যন্ত পুত্রকে পিতামাতার সিদ্ধান্ত মানিয়া চলিতে হইবে এবং তাহাদের ভক্তি করিতে হইবে।

এই ভাবে যে সাধারণ মানবীয় নীতি বিভিন্ন অবস্থায় মানুষের ব্যবহারের যৌক্তিকতা বা অযৌক্তিকতা নির্ধারণ করে আমরা সেই নীতিকেই ধর্ম বলি। ধর্মের নিকটতম পরিভাষা হইতে পারে 'Innate Law', যদিও ইহাতে ধর্মের পূর্ণ অর্থ পরিস্ফুট হয় না। যেহেতু ধর্মের স্থান সর্বোচ্চ সেইজন্য আমাদের রাষ্ট্রের আদর্শ ধর্মরাজ্য। পূর্বে অভিষেককালে রাজাকে তিনবার উচ্চারণ করিতে হইত 'এমন কেহ নাই যে আমাকে শাস্তি দিতে পারে'। এই প্রকার দাবি ইউরোপের রাজারাও করিতেন এবং বলিতেন যে রাজা কোনও অন্যায় করিতে পারে না। এই কথা উচ্চারণের পর পুরোহিত রাজার পৃষ্ঠে একটি দন্ড দ্বারা আঘাত করিয়া বলিতেন, "না, তুমি সর্বশক্তিমান নহ, তুমি ধর্মের অধীন।" রাজা তখন যজ্ঞস্থল পরিক্রমা করিতেন এবং পুরোহিত তাহার পৃষ্ঠে দণ্ডাঘাত করিতে করিতে তাহার পশ্চাতে চলিতেন। তিনবার প্রদক্ষিণের পর অনুষ্ঠান সমাপ্ত হইত। এইভাবে রাজাকে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলা হইত যে তুমি শক্তির ঊর্ধ্বে নহ। রাজার উপরেও ধর্মের স্থান স্বীকৃত হইত।

জনসাধারণ কি যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারে? বলা হইতে পারে যে হ্যাঁ, গণতন্ত্রের তাহাই অর্থ। জনগণ যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারে। কিন্তু আমাদের দেশে জনগণ ইচ্ছা করিলেও ধর্মনীতির বিরুদ্ধাচারণ করিতে পারে না। একদিন এক পুরোহিতকে প্রশ্ন করা হইল যে ভগবান যখন সর্বশক্তিমান তখন কি তিনি ধর্মের বিরুদ্ধাচারণ করিতে পারেন? যদি তাঁহার সে অধিকার না থাকে তবে তিনি সর্বশক্তিমান কিরূপে? ইহা জটিল প্রশ্ন। প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বরও ধর্মের বিরুদ্ধাচারণ করিতে পারেন না। অধর্ম দুর্বলতার প্রতীক—শক্তির পরিচায়ক নহে। যদি অগ্নির দাহিকাশক্তি না থাকে তবে তাহা নির্বাপিত হয়—তাহার কোনও শক্তি থাকে না। শক্তির পরিচয় যথেচ্ছ আচরণ নয়, শক্তির পরিচয় সংযমে। অতএব সর্বশক্তিমান ঈশ্বরও স্বসংযত ও ধর্মের অনুগত। ভগবান মানবদেহ ধারণ করেন অধর্মের বিনাশ ও ধর্ম সংস্থাপনের

উদ্দেশ্যে; শুধু খেয়ালখুশী চরিতার্থ করিবার জন্য নহে। সুতরাং বলা যায় যে ধর্ম ঈশ্বর অপেক্ষাও বড়। বিশ্বজগত জীবিত থাকার কারণ তিনি ধর্ম অনুযায়ী কর্ম করেন। রাজাকে বিষ্ণুর অবতার মনে করা হইত, কারণ তিনি ধর্মরাজ্যের প্রধান রক্ষক।

## ধর্মরাজ্যের অর্থ Theocratic State নহে

ধর্মরাজ্যের অর্থ Theocratic State বা সম্প্রদায়বাদী রাষ্ট্র নহে। আমাদের এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ হইতে হইবে। যেখানে কোনও সম্প্রদায় ও তাহার গুরু বা প্রবর্তক সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী—তাহা সম্প্রদায়বাদী রাষ্ট্র। সমস্ত অধিকার এই বিশেষ সম্প্রদায়ের লোকেরই সেখানে থাকে। সেখানে অপর সম্প্রদায়ের লোক বাস করিতে পারে না বা করিলেও ক্রীতদাসের ন্যায় জীবন যাপন করে। পবিত্র রোম সাম্রাজ্যর এই ভিত্তিই ছিল। খিলাফতের পশ্চাতেও এই আদর্শই বর্তমান। সমস্ত পৃথিবীতে মুসলমান রাজারা খলিফার নামে রাজ্য শাসন করিয়াছেন। এখন আবার এই ব্যবস্থা পরিবর্তনের চেষ্টা হইতেছে। সাম্প্রতিক সম্প্রদায়বাদী রাষ্ট্র পাকিস্তান। তাহারা নিজেদের ইসলামিক রাষ্ট্র বলে। সেখানে মুসলমান ব্যতীত সকল সম্প্রদায় দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক। এতদ্ব্যতীত সেখানে কোনও অ-ইসলামীয় লক্ষণ নাই। কোরান, মসজিদ, রোজা, নামাজ ও ঈদ ইত্যাদি ভারত ও পাকিস্তানে একই। রাষ্ট্রের সহিত উপাসনা পদ্ধতির কোনও সম্পর্ক নাই। ইহাতে ব্যক্তির কোনও বিশেষ উপকার হয় না, শুধু রাষ্ট্র তাহার দায়িত্ব এড়াইয়া যায়। ধর্মরাজ্যে ইহা সম্ভব নহে। সেখানে উপাসনার অধিকার স্বীকৃত। সম্প্রদায়বাদী রাষ্ট্রে বিশেষ সম্প্রদায়ের উপাসনা পদ্ধতির অধিকার ও সুযোগ থাকে এবং অপর সকল সম্প্রদায়ের উপাসনা পদ্ধতির উপর বিধিনিষেধ আরোপিত হয়। ধর্মরাজ্য শান্তি, শৃঙ্খলা ও সমৃদ্ধির জন্য সকল উপাসনা পদ্ধতি মানিয়া চলে। সুতরাং রাষ্ট্রের পরিবেশ এমন হওয়া প্রয়োজন যে প্রত্যেক ব্যক্তি তাহার রুচি অনুযায়ী শান্তিতে জীবনযাপন করিতে সক্ষম হয়। এজন্য সহনশীলতা প্রয়োজন। প্রত্যেকের স্বাধীনতা সীমাবদ্ধ। আমার হাত নাড়িবার অধিকার আছে কিন্তু যখনই আমার হাতের সহিত কাহারও নাকের সংঘর্ষ ঘটে তখনই হাত নাড়িবার অধিকার সঙ্কুচিত হয়। যেখানে অপর ব্যক্তির অধিকার খর্ব হয় সেখানেই আমার অধিকারের সমাপ্তি। এইভাবে উপাসনা পদ্ধতির বাঁচিবার অধিকার আছে। ধর্মরাজ্য উপাসনার স্বাধীনতা (ধর্মীয় স্বাধীনতা) স্বীকার করে কিন্তু কোনও উপাসনার অধিকার ক্ষুন্ন করে না।

আজকাল 'সেকুলার রাষ্ট্র' কথাটি সম্প্রদায়বাদী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে পরিভাষা হিসাবে ব্যবহৃত হইতেছে। ইহা পাশ্চাত্য চিন্তার অনুকরণের পরিণতি। আমাদের এই শব্দ আমদানির কোনও প্রয়োজন ছিল না। আমরা পাকিস্তানের সহিত পার্থক্য বুঝাইবার জন্য সেকুলার শব্দ ব্যবহার করিয়াছি। ইহার ফলে কতকটা ভ্রান্ত ধারণা সৃষ্টি হইয়াছে। রিলিজিয়নকে ধর্মের পর্যায়ে ফেলার পরে সেকুলার রাষ্ট্রের অর্থ ধর্মবিচ্যুত রাষ্ট্র বলিয়া মনে করা হইতেছে। কেহ কেহ বলেন যে

আমাদের রাষ্ট্র ধর্মহীন রাষ্ট্র। কেহ কেহ আবার সুন্দর করিয়া বলিবার চেষ্টা করেন যে, ইহা ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্র। কিন্তু এই সকল শব্দই ভ্রমাত্মক। কারণ রাষ্ট্র কখনই ধর্মহীন বা ধর্ম উদাসীন হইতে পারে না—যেমন অগ্নির দাহিকা শক্তি না থাকিলে তাহা অগ্নি থাকে না।

যে রাষ্ট্র মূলতঃ ধর্মরক্ষার জন্য সৃষ্ট হইয়াছে তাহা ধর্মহীন বা ধর্মনিরপেক্ষ কিরূপ হইতে পারে? যদি ইহা নিঃধর্মী হয় তবে তাহা নীতিহীন বা সেখানে নীতি নিয়ম নাই, সে রাষ্ট্রের কোনও অস্তিত্ব থাকে না। অর্থাৎ ধর্মনিরপেক্ষতা বা ধর্মহীনতার আদর্শ ও রাষ্ট্রের আদর্শ স্ববিরোধী। রাষ্ট্র ধর্মরাজ্য ব্যতীত আর কিছুই হইতে পারে না। অন্য যে কোনও ব্যাখ্যা রাষ্ট্র গঠনের যুক্তি বা রাষ্ট্রের অস্তিত্ব বিরোধী হইবে।

বর্তমানে এক বাদানুবাদ সৃষ্টি হইয়াছে—পার্লামেন্ট সর্বশক্তিমান না সুপ্রিম কোর্ট সর্বশক্তিমান? বিধানসভা বড় না বিচারালয় বড়। দক্ষিণ হস্ত বড় না বাম হস্ত বড় এই প্রকার অসার তর্ক মাত্র। ন্যায়ালয় ও বিধানসভা উভয়ই রাজ্যের দুইটি অঙ্গ। উভয়েরই বিশেষ কর্তব্য আছে। তাহাদের নিজস্বক্ষেত্রে উভয়েই প্রধান। ইহাদের দুইটির মধ্যে কে বড় ও কে ছোট বিচার করিবার চেষ্টা ভ্রান্তিমাত্র। বিধানসভা যে নীতি ও ন্যায় প্রবর্তন করে, ন্যায়ালয় তাহা ব্যাখ্যা করে। প্রকৃতপক্ষে উভয়েরই অধিকার সমান। উভয়েই সংবিধানের অধীন এবং ধর্ম সংবিধানের মূলভিত্তি। তাহাদের উভয়কেই ধর্ম অনুযায়ী কর্ম করিতে হইবে। কেহ কেহ বলিবেন যে, জনগণ সর্বক্ষমতার অধিকারী, কারণ তাহারা নির্বাচন করে। কিন্তু লোকে কি ধর্ম ও নীতির বিরুদ্ধে যাইতে পারে? যদি কোনও সরকার অধর্ম আচরণকারীকে শাস্তি না দেয় তবে তাহা চোরের সরকার। কল্পনা করুন যে যদি কোনও প্রকারে চোরেরা ক্ষমতালাভে সক্ষম হয় এবং একজন চোরকে শাসক নিযুক্ত করে তবে কি হইবে? তখন সংখ্যালঘুদের কর্তব্য কি? অবশ্যই তাহাদের এই বহু মতে নির্বাচিত চোরের রাজত্বের অবসান ঘটাইতে হইবে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে হিটলার ফ্রান্স আক্রমণ করেন এবং ফরাসিরা নাজি বাহিনীর অগ্রগতি রোধ করিতে পারেন নাই। তখন ফ্রান্সের প্রধানমন্ত্রী মার্শাল পেঁতা আত্মসম্পর্ণ করিলেন এবং ফরাসি জনসাধারণ এই সিদ্ধান্ত সমর্থন করিল। কিন্তু জেনারেল দ্য গল লন্ডনে পালাইয়া আসিলেন এবং ঘোষণা করিলেন যে তিনি এই পরাজয় স্বীকার করেন নাই। লন্ডনে বসিয়া তিনি নির্বাসিত ফরাসি সরকার গঠন করিলেন এবং ঘটনাক্রমে ফ্রান্সে স্বাধীনতা অর্জন করিলেন। এখন যদি বহুমতের সিদ্ধান্ত মানিতে হয় তবে তো দ্য গলের কার্য নিন্দনীয় ছিল। তাঁহার স্বাধীনতা সংগ্রামের তবে তো কোনও অধিকার ছিল না। কিন্তু দ্য গলকে কেহ অনধিকারী বলিতে পারে নাই, কারণ তিনি ফরাসি জাতির স্বাধীনতার যে মূলনীতি সেখান হইতে এই অধিকার লাভ করিয়াছিলেন এবং জাতির এই মূলগত অধিকার Majority Public Opinion বা সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামতের অনেক উর্ধ্বে। আমাদের দেশেও অধিকাংশ ভারতবাসী ইংরাজের বিরুদ্ধাচারণ করে নাই সামান্য কিছু সংখ্যক লোক করিয়াছিলেন। লোকমান্য তিলক ঘোষণা

করিলেন 'Freedom is my birthright'—স্বরাজ আমার জন্মগত অধিকার। আজকাল কেহ কেহ বলেন "গোয়ার ভারতভুক্তি গণভোট দ্বারা নির্ধারিত হউক। কাশ্মীরে জনমত গ্রহণ করা হউক।" ইহা অন্যায়। জাতীয় সংহতি আমাদের ধর্ম। এ সম্পর্কে কাহারও অন্য কোনও মত প্রকাশের অধিকার নাই। বহু মতে কে কিভাবে দেশ শাসন করিবে তাহা নির্ধারিত হইতে পারে কিন্তু সার্বভৌমত্ব বা দেশের অখণ্ডত্ব বহুমতের অপেক্ষা করে না।

আপনারা সকলেই জানেন যে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র যেখানে সকলে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে শপথ গ্রহণ করেন, সেখানে আব্রাহাম লিংকন একবার ভ্রান্ত জনমত স্বীকার করেন নাই। যখন দাসপ্রথা উচ্ছেদের প্রশ্নে দক্ষিণী রাজ্যগুলি যুক্তরাষ্ট্র হইতে সরিয়া যাইবার সিদ্ধান্ত করিল তখনও লিংকন দৃঢ়ভাবে বলিলেন গণতন্ত্রে তোমাদের পৃথক হইবার কোনও অধিকার নাই। এ বিষয়ে তিনি কোন আপোস করেন নাই। তিনি তাহাদের পৃথক হইতে দিলেন না এবং দাসপ্রথাও সহ্য করিলেন না। তিনি তো আপোস হিসাবে আংশিক দাসপ্রথা চালু রাখিবার কথা বলিতে পারিতেন, কিন্তু তিনি তাহার পরিবর্তে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করিলেন যে দাসপ্রথা আমেরিকান জাতির ঐতিহ্য ও ধর্মের বিরোধী, অতএব তাহার অবসান ঘটাইতেই হইবে। তিনি গৃহযুদ্ধে রত হইলেন কিন্তু অর্ধমের সহিত সন্ধি করিলেন না।

ইহা অনেকটা আমাদের দেশের প্রাচীন হিন্দু বিবাহের অনুরূপ। বিবাহিত স্বামী বা স্ত্রীর বিবাহ বিচ্ছেদের অধিকার ছিল না। এমনকী উভয়পক্ষ একমত হইলেও বিচ্ছেদের অধিকার লাভ করিত না। আদর্শ এই ছিল যে তাহাদের আচরণ তাহাদের ইচ্ছা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইবে না, নীতি বা ধর্মদ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইবে। যদি কাশ্মীরের চল্লিশ লক্ষ মুসলমান বলে যে তাহারা পৃথক হইতে চাহে,যদি গোয়ার লোকেরা বলে যে তাহারা বিচ্ছেদ চায়, যদি তাহারা বলে পর্তুগীজরা ফিরিয়া আসুক তবে তাহা স্বীকৃত হইবে না, কারণ ইহা ধর্মের পরিপন্থী। যদি ভারতের ৮৬ কোটি লোকের মধ্যে ৮৫ কোটি ৯৯ লক্ষ ৯৯ হাজার ৯৯৯ জন লোকও এমন কাজ করে যাহা ধর্মবিরোধী, তাহা হইলেও সেই কার্য সত্য হইবে না। পক্ষান্তরে একজন লোকও যদি ধর্মপথে থাকে তবে তাহারই আচরণ সত্য বলিয়া স্বীকৃত হইবে। সেই একজন লোকের কর্তব্য হইবে—অন্যান্য লোকদের ধর্ম বা ন্যায়াচরণে প্রবুদ্ধ করা।

ধর্ম বহু মতের দ্বারা নির্ধারিত হয় না। ইহা সনাতন চিরন্তন (Eternal)। সুতরাং গণতন্ত্রের যে ব্যাখ্যা অর্থাৎ ইহা জনগণের সরকার তবে তাহাই যথেষ্ট হইবে না—ইহাকে জন-কল্যাণকারী হইতে হইবে। লোকের কিসে কল্যাণ হইবে তাহা ধর্ম দ্বারাই নিরূপিত হইতে পারে। গণতন্ত্রে যে বর্ণনা 'Government of the people, for the people, by the people' ইহার মধ্যে of অর্থ স্বাধীনতা, by অর্থ গণতন্ত্র এবং for অর্থ ধর্ম। অতএব প্রকৃত গণতন্ত্র তাহাই যেখানে স্বাধীনতা এবং ধর্ম বিরাজিত। এই আদর্শ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের প্রকৃত পরিভাষা—ধর্মরাজ্য।

# ৪ রাজ্য ধর্ম ও ধর্মরাজ্য

ভারতীয় ঐতিহ্য অনুযায়ী জাতি ব্যক্তির সমষ্টিমাত্র নহে—ইহা স্বয়ম্ভু। ইহা কেহ গঠন করে নাই। জাতি আবার তাহার প্রয়োজন পূরণের জন্য এবং তাহার মূল প্রকৃতির বাস্তব রূপদানের জন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলে। রাজ্য এই সকল প্রতিষ্ঠানের অন্যতম এবং যদিও তাহার প্রয়োজন অত্যধিক তথাপি ইহা সর্বোচ্চ স্থানের অধিকারী নহে। আমাদের সাহিত্যের যেখানেই রাজার কর্তব্যের কথা বলা হইয়াছে সেখানেই তাঁহার প্রয়োজনীয়তা ব্যক্ত করা হইয়াছে। ইহা সম্ভবতঃ তাহার অসীম দায়িত্ব উপলব্ধির জন্য করা হয়। প্রজাবর্গের জীবন ও চরিত্র নির্ধারণে রাজার বিশেষ প্রভাব থাকে। সুতরাং তাহার নিজস্ব আচরণ সম্পর্কে সচেতন থাকা অত্যাবশ্যক। মহাভারতে পিতামহ ভীষ্ম এই কথাই বলিয়াছেন। তাহাকে প্রশ্ন করা হইয়াছে যে রাজা পরিস্থিতি সৃষ্টির কারণ। আজকাল কেহ কেহ ইহা এইভাবে ব্যাখা করে যে রাজা সর্ববিষয়ের ঊর্ধ্বে। কিন্তু ইহা সত্য যে ধর্মের উপরে রাজার স্থান। রাজা ধর্ম ও সমাজের রক্ষক হিসাবে অসীম শক্তির অধিকারী, কিন্তু তিনি ধর্ম অনুযায়ী কর্ম করিতে বাধ্য। তাঁহার স্থান বর্তমানের শাসনকর্তাদের অনুরূপ।

বর্তমান রাজ্যে শাসনকর্তারা আইন অনুযায়ী শাসনের অধিকারী, কিন্তু তাঁহারা আইন প্রণয়নের অধিকারী নহেন। যখন শাসনকর্তারা সততা ও যোগ্যতার সহিত কার্য করেন না তখন আইন অবহেলিত হয়। আজকাল এই অবস্থাই ঘটিতেছে। সুতরাং আমরা বলিতে পারি যে বর্তমানের নানা সমস্যা সৃষ্টির কারণ এই শাসকবর্গ। মদ্যপান নিষেধ-বিধি কেন কার্যকর হয় নাই? যে ব্যক্তিদের উপর এই আইন প্রয়োগের দায়িত্ব তাঁহারাই যখন উৎকোচের বশীভূত হন তখন তাহা কার্যকরী করা যায় না। ভীষ্মের উক্তির অর্থ ইহাই। ইহাকে রাজা সর্বশক্তিমান' এইভাবে ব্যাখ্যা করা অনুচিত। যদি তাহাই হইত তবে ঋষিগণ অত্যাচারী রাজা রেণুকে অপসারণ পূর্বক পৃথুকে রাজা করিয়াছিলেন কিরূপে? ঋষিদের এই কার্য সর্বজন সমাদৃত হইয়াছে। অধর্মচারী রাজাকে পদচ্যুত করার অধিকার ঋষিরা ধর্মের নিকট লাভ করিয়াছেন।

পাশ্চাত্যদেশে রাজা হয় অন্য রাজা কর্তৃক অপসৃত হয়ে অথবা জনগণ তাঁহার কর্তৃত্ব সম্পূর্ণ অস্বীকার করে। কিন্তু সেখানে রাজাকে ভগবানের প্রতিনিধি বলিয়া স্বীকার করা হয় ও নীতিগতভাবে তাহাকে অপসারণের অধিকার কাহারও নাই।

আমাদের সমাজে রাজনীতিতে রাজ্য বা রাজাকে কখনই সর্বপ্রধান বলিয়া স্বীকার করা হয় নাই। সেখানে রাজা ব্যতীত আরও অনেক প্রতিষ্ঠান ছিল। এই সমস্ত প্রতিষ্ঠান আঞ্চলিক এবং জীবিকা অনুযায়ী সংগঠিত হইয়াছিল। আমরা পঞ্চায়েত ও জনপদ সভার প্রবর্তন করিয়াছিলাম। মহাশক্তিশালী রাজারাও পঞ্চায়েতগণকে বিব্রত করেন নাই। ঠিক এই মত ব্যবসায়ের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠান গঠিত ছিল। তাহাদের উপরেও হস্তক্ষেপ করিত না। তাহাদের স্বায়ত্ব শাসনাধিকার সর্বদা স্বীকৃত হইত। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের, শ্রেণীর, নিগমের, গ্রামের ও জনপদ সভার নিজস্ব পঞ্চায়েত ব্যবস্থা ছিল। তাঁহারাই নিজ নিজ প্রয়োজনে নীতি বা অনুশাসন প্রবর্তন করিতেন। রাজার কর্তব্য ছিল যে লোকে যাহাতে এই সকল নিয়মকানুন বা অনুশাসন মানিয়া চলে তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখা। রাজা কখনও এই সকল প্রতিষ্ঠানের কার্যে হস্তক্ষেপ করিত না। এইভাবে রাজা শুধু সমাজ জীবন অব্যাহত রাখার জন্য নিযুক্ত থাকিত।

এইভাবে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠা হয়। আমাদের এমন একটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ছিল, যাহা আমাদের মনুষ্যোচিত গুণাবলী, সভ্যতা এবং পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য গঠিত হইয়াছিল। আমাদের ধারণা জীবনে ক্রমাগত উন্নতির ফলে সম্পূর্ণতা ও ঈশ্বর প্রাপ্তি হয়। আমাদের অর্থনীতি কীভাবে এই আদর্শ পূরণ করিতে পারে আমরা এইবার সেই আলোচনা করিব।

অর্থনৈতিক ব্যবস্থার দ্বারা ব্যক্তির রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় বস্তু উৎপাদন ও জাতির সংরক্ষণ হওয়া আবশ্যক। ন্যূনতম প্রয়োজন মিটিবার পরে স্বভাবতই এই প্রশ্ন আসে যে তাহাদের অধিকতর সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য আরও অধিক উৎপাদন উচিত কিনা? পাশ্চাত্য জগৎ ইহা অত্যাবশ্যক মনে করে এবং ক্রমাগতঃ মানুষের প্রয়োজন ও আগ্রহ বৃদ্ধির চেষ্টা করে। স্বাভাবিকভাবে প্রয়োজন অনুযায়ী উৎপাদন হয়। কিন্তু বর্তমানে ইহা ভিন্নরূপ ধারণ করিয়াছে। যে সকল বস্তু উৎপাদিত হইতেছে তাহা প্রাপ্তির জন্য জনমনে অধিকতর আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত করার প্রয়াস দেখা যাইতেছে। যদি চাহিদা নাও থাকে তথাপি চাহিদা বাড়াইবার চেষ্টা করিতেছে। ইহাই বর্তমানে পাশ্চাত্যের অর্থনৈতিক বিশেষত্ব হইয়া দাঁড়াইয়াছে। উদাহরণ স্বরূপ চায়ের ব্যবহারের কথা ধরা যাক। চা ব্যক্তির প্রয়োজনে উৎপাদিত হয় নাই কিন্তু চা উৎপাদন করা হইয়াছে এবং আমাদের চা পানের আগ্রহ সৃষ্টি করা হইয়াছে। বর্তমানে ইহা সাধারণ মানুষের পানীয়। বনস্পতি (ভোজ্য তৈল) সম্পর্কেও ঠিক এই কথাই বলা যায়। কেহ কি ইহা চাহিয়াছিল? ইহা প্রথমে উৎপাদিত হইল এবং তাহা আমরা ব্যবহার করিতে শিখিলাম। যদি কোনও কিছু উৎপন্ন হয় এবং তাহার চাহিদা না থাকে তবে মন্দার ভাব দেখা যাইবে। আমাদের অনেকের

১৯৩০-৩২ এর কথা স্মরণ আছে। সেই সময় প্রচুর দ্রব্য উৎপাদন হয় কিন্তু সেই অনুপাতে চাহিদা ছিল না। ফলে বহু কারখানা বন্ধ হইয়া যায়। বহু ব্যবসায়ে লালবাতি জ্বলে এবং সর্বত্র বেকার সমস্যা দেখা দেয়। সুতরাং বর্তমানে যাহা উৎপন্ন হয় তাহা বিক্রিত হওয়া বিশেষ প্রয়োজন।

ইংরাজি সাপ্তাহিক Organizer পত্রিকার সম্পাদক কিছুদিন পূর্বে আমেরিকা গিয়াছিলেন। তিনি ফিরিয়া আসিয়া একটি অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন। সেখানে আলুর খোসা ছাড়াইবার যন্ত্র প্রস্তুতকারী একটি কারখানা আছে। এই কারখানার উৎপাদন চাহিদার তুলনায় অত্যধিক হওয়ায় কারখানার কর্তৃপক্ষ বিব্রত হইয়া পড়েন। অধিক চাহিদা সৃষ্টির জন্য তাঁহাদের একজন বিক্রেতা একটি অভিনব প্রস্তাব দেন। ইহাতে যন্ত্রগুলির হাতলের রং আলুর খোসার মত করিবার উপদেশ দেওয়ার হয় যাহাতে খোসার সহিত ভ্রমক্রমে এই যন্ত্রগুলিও আস্তাকুঁড়ে ফেলার সম্ভবনা থাকে। ইহাতে আরও চাহিদা বাড়িবে এই ছিল তাঁহার যুক্তি। এইভাবে মোড়কগুলি অধিকতর আকর্ষণীয় করার ব্যবস্থা হইল। কিন্তু অর্থনৈতিক কাঠামো শুধু কোনও দ্রব্য ব্যবহারের উপর গড়িয়া উঠে না—ইহার ফলে আর্থিক কাঠামো ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। ব্যক্তির প্রয়োজনীয় চাহিদা পূরণের পরিবর্তে অধিকতর চাহিদা সৃষ্টি বর্তমান অর্থনীতির আদর্শ হইয়া উঠিয়াছে। আমাদের সীমাবদ্ধ প্রাকৃতিক সম্পদ সম্পর্কে চিন্তা করার প্রয়োজন। কারণ সেখানে প্রকৃতির বিভিন্ন অংশের সহিত অপরাংশের পারস্পরিক সম্পর্ক রহিয়াছে। যদি তিনটি কাঠি একত্রে দাঁড়াইয়া থাকে তবে তাহার কোনও একটি সরাইয়া লইলে অপর দুইটির পতন অনিবার্য। বর্তমান অর্থনৈতিক পদ্ধতি ও উৎপাদন দ্রুতগতিতে প্রকৃতির ভারসাম্য নষ্ট করিতেছে। ফলে একদিকে যেমন ক্রমবর্ধমান চাহিদা মিটাইবার জন্য নব নব দ্রব্য উৎপাদিত হইতেছে, তেমনই অপরদিকে প্রত্যহ নূতন নূতন সমস্যার সৃষ্টি হইয়া সমস্ত বিশ্বসমাজ ও সভ্যতা ধ্বংসের আশঙ্কা দেখা দিতেছে।

সুতরাং প্রাকৃতিক সম্পদ এমনভাবে ব্যবহৃত হওয়া উচিত যাহাতে প্রকৃতি সহজেই তাহা পূরণ করিতে সক্ষম হয়। যখন ফল গ্রহণ করা হয় তখন তাহাতে বৃক্ষের অপকার হয় না বরং তাহার উপকারই হয়। কিন্তু অধিকতর শস্য উৎপাদনের চেষ্টায় রাসায়নিক সার ব্যবহার করার ফলে কয়েক বৎসরের মধ্যে ভূমির উর্বরাশক্তি নষ্ট হয়। এই কারণে আমেরিকায় লক্ষ লক্ষ একর জমি শস্যহীন হইয়া রহিয়াছে।

কতদিন এই ধ্বংসের নৃত্য চলিতে পারে?

শিল্পপতিরা তাহাদের ক্রমশঃ ক্ষীয়মান যন্ত্রপাতির পরিবর্তে নূতন যন্ত্রপাতি আমদানির জন্য একটি ক্ষয়পূরণ তহবিল সৃষ্টি করেন। তাহা হইলে প্রকৃতির ক্ষয়পূরণ তহবিল কেমন করিয়া অবহেলা করিব? এই দিক হইতে বিচার করিতে গেলে আমরা বুঝিতে পারিব যে প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহারের ক্ষেত্রে অমিতব্যয়ী হইতে চলিবে না বরং সংযমী হইতে হইবে।

যাহা প্রয়োজন তাহা অবশ্যই গ্রহণ করিতে হইবে। এইজন্য ঈশ্বর প্রচুর সম্পদ আমাদের দিয়াছেন। শুধু উৎপাদন ও ব্যবহারের জন্য মানুষের সৃষ্টি হয় নাই। ইঞ্জিনের কয়লা প্রয়োজন কিন্তু কয়লা জ্বালানই ইঞ্জিনের উদ্দেশ্য নয়। পক্ষান্তরে যতসম্ভব কম কয়লা ব্যবহার দ্বারা শক্তি সংগ্রহের উদ্দেশ্য। ইহাই অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি। এই আদর্শ স্মরণ রাখিয়া আমাদেরও মানবজীবনে ন্যূনতম বস্তু ব্যবহার দ্বারা অধিকতম দ্রুত লক্ষ্যে উপনীত হইতে হইবে। এই ব্যবস্থাই প্রকৃত সভ্যতা। এই ব্যবস্থায় মানুষ একদেশদর্শী হইতে পারিবে না এবং জীবনের সকল দিক এমনকী পরম লক্ষ্যের কথাও উপলব্ধি করিবে। ইহাতে প্রকৃতিকে শোষণ করা হইবে না—ইহা দ্বারা প্রকৃতির পোষণ হইবে এবং নিজেরও শ্রীবৃদ্ধি ঘটিবে। গো-হত্যা না করিয়া তাহার দুগ্ধ পান যেমন বাঞ্ছনীয়, তেমনই প্রকৃতিকে ধ্বংস না করিয়া তাহার অতিরিক্ত উৎপাদন আমাদের জীবন রক্ষার জন্য গ্রহণ করাই আমারে কাম্য।

এই মানবীয় দৃষ্টিভঙ্গি যদি অর্থব্যবস্থাকে উদ্বুদ্ধ করে তবে অর্থনৈতিক চিন্তায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটিবে। পশ্চিমি দেশগুলির (তাহা পুঁজিবাদী বা সমাজতন্ত্রবাদী যাহাই হউক না কেন) অর্থনীতিতে মূল্যকে প্রধান স্থান দেওয়া হইয়াছে। সকল অর্থনৈতিক চিন্তা 'মূল্যের' দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। অর্থনৈতিক দৃষ্টিতে মূল্য সম্পর্কে বিশ্লেষণ প্রয়োজনীয় হইতে পারে কিন্তু যে সমাজচিন্তা সম্পূর্ণভাবে মূল্যের উপর গড়িয়া উঠে তাহা অসম্পূর্ণ, অমানবীয় ও কতকাংশে ন্যায়নীতির বিরোধী। উদাহরণ স্বরূপ একটা শ্লোগান আজকাল প্রায়ই শোনা যায় তাহার কথাই ধরা যাক। ব্যক্তিকে অন্ন অর্জন করিতেই হইবে—সাধারণতঃ কম্যুনিষ্টরা এই শ্লোগান দেয় কিন্তু পুঁজিবাদীরাও পুঁজি ও উদ্যোগকে উৎপাদনের জন্য সর্বাধিক প্রয়োজনীয় মনে করে এবং সেইজন্য লভ্যাংশের অধিক চাহেন। তাঁহারা মনে করেন যে ইহা তাঁহাদিগের ন্যায্য প্রাপ্য। পক্ষান্তরে কম্যুনিষ্টরা মনে করেন যে একমাত্র শ্রমই উৎপাদনের প্রধান উপাদান। সুতরাং তাঁহারা উৎপাদনের বৃহত্তর অংশ শ্রমিকেরই প্রাপ্য বলিয়া দাবি করেন। এই দুইটি মতের কোনওটিই সত্য নহে। আমাদের আদর্শ যে ব্যক্তি উপার্জন করিবে তাহাকে দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হইবে এবং প্রত্যেক ব্যক্তির যথেষ্ট আহার্য জোগাইতে হইবে। অন্নের অধিকার জন্মগত। উপার্জনের শক্তি বিদ্যা ও শিক্ষা সাপেক্ষ। সমাজে যাহারা উপার্জন করিতে পারে না তাহাদেরও আহারের অধিকার আছে। শিশু এবং বৃদ্ধ, রুগ্ন এবং অশক্ত সকলের দায়িত্বই সমাজের প্রায় প্রত্যেক সমাজই এই দায়িত্ব প্রতিপালন করেন। অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় এই আদর্শকে সার্থক করিতে হইবে। কোনও ব্যক্তি শুধু তাহার রুটির জন্য কার্য করে না—এই আদর্শ পূরণের জন্যই পরিশ্রম করে। অন্যথায় যাহাদের আহার্য আছে তাহারা কার্য করিত না।

'খাদ্য, বস্ত্র ও বাসগৃহ' মানুষের প্রাথমিক প্রয়োজন। যে কোনও অর্থব্যবস্থাকে এই প্রয়োজন পূরণ করিতে হইবে। সেই সঙ্গে প্রত্যেক ব্যক্তিকে সমাজের প্রতি তাহার দায়িত্ব পালনে উদ্বুদ্ধ করার শিক্ষা সমাজকেই দিতে হইবে। যদি কোনও ব্যক্তি রোগাক্রান্ত হয় তবে তাহার দায়িত্বও সমাজকেই গ্রহণ করিতে হইবে। যদি কোনও সরকার এই প্রাথমিক প্রয়োজন পূর্ণ করে তবে

তাহাকে ধর্মীয় শাসন বলা যায়। অন্যথায় ইহা অধর্মের রাজ্য। কালিদাস তাঁহার রঘুবংশে রাজা দিলীপের বর্ণনায় বলিয়াছেন, 'প্রজাদের পালন, রক্ষা ও শিক্ষা দিতে তিনি পিতৃতুল্য ছিলেন।' নৃপতি ভরত—যাঁহার নামে আমাদের দেশের নাম ভারতবর্ষ হইয়াছে তাঁহার বর্ণনাতেও রাজাকে প্রজাপালক ও রক্ষাকর্তা বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। যদি এই দেশে পোষণ ও সংরক্ষণের নিশ্চয়তা না থাকে তবে এই দেশের ভারত নাম অর্থহীন।

## শিক্ষা সামাজিক দায়িত্ব

শিশুকে শিক্ষাদান সমাজের স্বার্থ। জন্মগতভাবে শিশু একটি জীব মাত্র। সে শিক্ষা ও সংস্কৃতির গুণে দায়িত্বশীল নাগরিকে পরিণত হয়। যদি বেতন দিতে না পারায় শিশু শিক্ষা হইতে বঞ্চিত হয় তবে সমাজই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আমরা বৃক্ষ রোপণের জন্য বা বীজবপনের জন্য অর্থ দাবি করি না। বরঞ্চ আমরা এজন্য ব্যয় করি। আমরা জানি যে যখন বৃক্ষ বড় হইবে তখন তাহা আমাদের ফল জোগাইবে। শিক্ষার জন্য অর্থ ব্যয় এই প্রকার পুঁজি বিনিয়োগ। ১৯৪৭ সালের পূর্বে ভারতবর্ষে কোনও দেশীয় রাজ্যে শিক্ষার জন্য অর্থ দাবি করা হইত না। গুরুকুলে বরং খাদ্য ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হইত। পূর্বে বিদ্যার্থীরা সমাজের নিকট সাহায্য ভিক্ষা করিত। কোনও গৃহস্থ বিদ্যার্থীকে ভিক্ষা দিতে অস্বীকৃত হইত না। অর্থাৎ সমাজ শিক্ষার ব্যয়ভার বহন করিত।

এই মত ব্যক্তির চিকিৎসার জন্য অর্থ দাবিও বিস্ময়কর। আমাদের দেশে সেই ব্যবস্থাই ছিল। আজকাল লোককে মন্দিরে গেলেও পয়সা দিতে হয়। তিরুপতি বা বালাজীর মন্দিরে প্রবেশ শুল্ক পঁচিশ পয়সা। যদিও দিবা দ্বিপ্রহরে এক ঘণ্টা ধর্মদর্শনের ব্যবস্থা আছে—এই সময় দর্শনী দিতে হয় না। যেন অন্যসময় অর্ধদর্শন হয়! সমাজকে মানুষের শরীর, মন, বুদ্ধি ও আত্মার বিকাশের ন্যূনতম প্রয়োজন পূরণ করিতে হইবে।

## সকলের কাজের ব্যবস্থা

ইহা স্পষ্ট যে ব্যক্তির ন্যূনতম প্রয়োজন পূরণের জন্য ব্যয়ভার নির্বাহের প্রয়োজনীয় অর্থ আমাদের উৎপাদন করিতে হইবে। সুতরাং যেখানে ন্যূনতম প্রয়োজন মিটাইবার ব্যবস্থা সমাজকে করিতে হইবে, তখন সেখানে সমাজের অঙ্গ হিসাবে ব্যক্তিকেও সমাজের স্বার্থে উপযুক্ত পরিশ্রম করিতে হইবে। যে ব্যবস্থায় উৎপাদন ব্যাহত হয় তাহা বিনাশের কারণ। ইহাতে ব্যক্তির কর্তব্য প্রতিপালিত হয় না। শুধু তাহাই নহে, যদি কাহারও প্রয়োজন পূরণ করা যায় অথচ সে সেই চেষ্টায় সহযোগিতা না করে তবে তাহার মানবীয় প্রগতি ব্যাহত হয়। মানুষের পাকস্থলী যেমন আছে, তেমন হাতও আছে। যদি সে কাজ না করে তবে খাদ্য পাইলেও সে সুখ পাইবে না। কর্মহীন মানুষ অসুখী হইতে বাধ্য।

আমাদের অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় কর্মক্ষম মানুষের সংস্থান করিতেই হইবে। বর্তমানে এক অদ্ভুত পরিস্থিতি লক্ষ করিতেছি। একদিকে দশ বৎসরের শিশু ও অশীতিপর বৃদ্ধকে কাজ করিতে হইতেছে, অপরদিকে পঁচিশ বৎসরেরর যুবক কর্মাভাবে আত্মহত্যা করিতেছে। এই অবস্থার অবসান ঘটাইতে হইবে। ঈশ্বর মানুষকে হাত দিয়াছেন কিন্তু তাহার শক্তি সীমাবদ্ধ। তাহাদের যন্ত্র বা মূলধনের প্রয়োজন। শ্রম ও মূলধনের সম্পর্ক মানুষ ও প্রকৃতির সম্পর্কে অবিকল অনুরূপ। উভয়ের সাহায্যেই এই পৃথিবীর সৃষ্টি হইয়াছে। ইহাদের কোনওটিকেই অবহেলা করা চলে না।

## মূলধন সৃষ্টি

মূলধন সৃষ্টির জন্য উৎপাদনের একাংশ সঞ্চয় অত্যন্ত আবশ্যক। ইহা দ্বারা অধিকতর উৎপাদন করিতে হইবে। সুতরাং মূলধন সৃষ্টির জন্য সংযমের প্রয়োজন। ইহাই মূলধন সৃষ্টির মূলনীতি যাহাকে কার্ল মার্কস অতিরিক্ত মূল্য বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় শিল্পপতিরা এই অতিরিক্ত মূল্য দ্বারা মূলধন সৃষ্টি করেন। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় রাজ্য এই দায়িত্ব গ্রহণ করে। উভয় ব্যবস্থাতেই সমস্ত অর্থই শ্রমিকের মধ্যে বিতরিত হয় না। যদি কোনও বৃহৎ কেন্দ্রীভূত শিল্প দ্বারা উৎপাদন করা হয় তবে মূলধন সৃষ্টিতে শ্রমিকের যে ভূমিকা তাহা উপযুক্ত স্বীকৃতি লাভ করে না। বিকেন্দ্রীকরণের সুবিধা এই যে শ্রমিক সেখানে এই অতিরিক্ত মূল্য বা মূলধন পরিচালনার প্রত্যক্ষ ভূমিকা সম্পর্কে অবহিত থাকে। যন্ত্র মূলধনের আধুনিক রূপ। মানুষের শ্রম লাঘব ও উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য যন্ত্রের আবিষ্কার হইয়াছে। সুতরাং যন্ত্র মানুষের সাহায্যকারী—প্রতিদ্বন্দ্বী নয়। যাহা হউক যেখানে মানুষের শ্রম অর্থের দ্বারা ক্রীত বস্তু হিসাবে বিবেচিত হয় সেখানেই যন্ত্র মানুষের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া দাঁড়ায়। পুঁজিবাদী সমাজের প্রধান ক্রটি এই যে যন্ত্রকে প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়া মানুষকে অবহেলা দ্বারা যন্ত্রের আবিষ্কারের আসল উদ্দেশ্যকেই অস্বীকার করা হইয়াছে। ইহা যন্ত্রের অপরাধ নয়। ইহা অর্থনৈতিক ও সমাজব্যবস্থার ক্রটি। আমাদের যন্ত্রের উপযোগিতার সীমা সম্পর্কে অবহিত হইয়া ইহার প্রয়োগের কথা চিন্তা করিতে হইবে। এইজন্য পাশ্চাত্য হইতে আমদানি করা (যেখানে লোক সংখ্যার স্বল্পতাহেতু যন্ত্রের প্রয়োগ অধিক) মারাত্মক ভ্রান্তি। যন্ত্রের উপযোগিতাও কালের দ্বারা নিরূপিত হয়। যন্ত্র বিজ্ঞানীগণের আবিষ্কার কিন্তু তাহাদের প্রতিনিধি নহে। বৈজ্ঞানিক জ্ঞানে কোনও দেশের একচেটিয়া অধিকার নাই। কিন্তু ইহার প্রয়োগকালে প্রত্যেক দেশের অবস্থা এবং উপযোগিতার বিষয় বিবেচনা করিতে হইবে। ইহা শুধু আমাদের আর্থিক প্রয়োজন দ্বারাই নির্ণীত হইবে না, আমাদের সামাজিক, রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক লক্ষ্যের কথাও এ সম্পর্কে স্মরণ রাখিতে হইবে।

অধ্যাপক বিশ্বেশ্বর রায় তাঁহার একটি পুস্তকে লিখিয়াছেন যে উৎপাদন ব্যবস্থা বিবেচনা করার সময় সাতটি M (Seven M)-এর কথা চিন্তা করিতে হইবে। এগুলি হইল—

১। Man (মানুষ)

২। Material (কাঁচামাল)

৩। Money (অর্থ)

৪। Management (পরিচালনা)

৫। Motive Power (শক্তি)

৬। Market (বাজার)

৭। Machine (যন্ত্র)

যে শ্রমিক কার্য করিবে তাহার দক্ষতা এবং ক্ষমতার কথা বিবেচনা করিতে হইবে।

প্রয়োজনীয় ও উপযুক্ত কাঁচামালের সহজ সরবরাহ থাকা চাই।

অর্থ ও মূলধন কত পাওয়া যাইবে ও কীভাবে ও কি পরিমাণে এই মূলধন বৃদ্ধি করা সম্ভব? ইহা পূর্ণ উৎপাদনের জন্য কীভাবে প্রযুক্ত হইতে পারে। ইহার কতটা স্থায়ী সম্পদ ও কতটা নগদে লগ্নী করা যাইবে? পশু ও মানুষের শ্রম ব্যতীত আর কি প্রকার শক্তি যেখানে পাওয়া যাইতে পারে? হাওয়া, জল, তেল, গ্যাস, বিদ্যুৎ বা আণবিক শক্তি—কোনটির সাহায্য পাওয়া বিবেচনা করিতে হইবে।

এই প্রকারে দক্ষ পরিচালনার বিষয়ও চিন্তা করা প্রয়োজন। যদি শ্রমিকদের শ্রম সুসংগঠিত না হয় তবে তাহার ফলে তাহারা কর্মহীন হইয়া থাকিবে।

উৎপাদিত দ্রব্যের উপযোগিতা, তাহার চাহিদা ইত্যাদিও বিবেচনার প্রয়োজন, পক্ষান্তরে আজকাল প্রথমে যন্ত্রের প্রবর্তন এবং পরে অন্যান্য আনুষঙ্গিক বিষয়ে চিন্তা করা হয়। কোনও দেশের শিল্পোন্নয়ন এই প্রকার নীতি দ্বারা হয় নাই।

এই সাতটি প্রয়োজনের একটিরও পরিবর্তনের উপায় নাই। যাহাদের উপর পরিকল্পনার দায়িত্ব তাহাদের—একথা চিন্তা করিতে হইবে। মানুষের উৎপাদন শক্তি বৃদ্ধির জন্য যন্ত্রের প্রয়োজন। কিন্তু যদি এমন হয় যে যন্ত্র প্রতিষ্ঠার ফলে লোক কর্মহীন হয় তবে তাহা সমস্যা সমাধানের পরিবর্তে সঙ্কটের সৃষ্টি করিবে। যদি বিদেশ হইতে অত্যাধিক মূল্যে যন্ত্র আমদানি করা হয় যাহার উৎপাদন আর্থিক লাভজনক না হয় তবে তাহা অযৌক্তিক। সুতরাং 'প্রত্যেক কর্মীকে খাদ্য দিতে হইবে' এভাবে চিন্তা না করিয়া 'যাঁহারা আহার করে তাহাদের সকলকে কাজ দিতে হইবে'—এইভাবে চিন্তা করা উচিত। চরকার পরিবর্তে যন্ত্রের ব্যবহার আবশ্যক কিন্তু তাহা এমন নয় যে সর্বত্র স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র ব্যবহার করিতে হইবে।

## অর্থনীতিতে মানুষের স্থান

মানুষের কর্মশক্তি ও কর্মের ব্যবস্থা মানুষের পূর্ণসত্তা সম্পর্কে অবহিত হইয়াই করিতে হইবে। গত কয়েক শতাব্দীর অর্থনৈতিক চিন্তাধারা মানুষের মনুষ্যত্ববোধকে উপেক্ষা করিয়াছে।

তাহার ব্যক্তিত্ব সম্পূর্ণ উপেক্ষিত হইয়াছে। পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে মানুষকে একটি 'আর্থিক মানুষ' হিসাবে বিচার করা হইয়াছে। এই আর্থিক মানুষের নিকট পাঁচ টাকা সর্বদা চার টাকা হইতে অধিক। সে কেবল অধিক অর্থ অর্জনের জন্য কাজ করে। অন্য সকল বস্তুর মত পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় মানুষের শ্রমও বাজারে ক্রয় বিক্রয়ের সামগ্রী। এই প্রতিযোগিতায় কেহই থামিতে চাহেন না এবং যে দুর্বল বা পশ্চাৎপদ হয় তাহার সাহায্যে কেহ আগাইয়া আসে না। সে একটি আর্থিক ভারস্বরূপ এবং তাহার অস্তিত্বের প্রয়োজন অস্বীকৃত হয়। ইহার ফলে আর্থিক শক্তি মাত্র কয়েকজন লোকের হস্তে পুঞ্জিভূত হয়; কিন্তু যখন একচেটিয়া অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয় তখন প্রতিযোগিতার দরুন যে বিবেচনা তাহাও অবশিষ্ট থাকে না এবং যথেষ্ট মূল্য নির্ধারণ এবং উৎপাদিত দ্রব্যের নাম নিম্নগামী হয়।

এমনকী খরিদ্দারের প্রয়োজন সম্বন্ধেও তাহার চাহিদা অপেক্ষা ক্রয়শক্তির কথাই পুঁজিবাদীরা বিবেচনা করে। যাহারা অর্থশালী তাহাদের কথাই অধিক চিন্তা করা হয়—যাহারা দরিদ্র বা অর্থ প্রদানে অক্ষম তাহাদের কথা চিন্তা করা হয় না। এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হয় যাহাতে খরিদ্দার উৎপাদকের নির্দেশ অনুযায়ী চলিতে বাধ্য হয়। অতএব পুঁজিবাদ মানুষের পূর্ণস্বত্তা বিকাশে অনুপযুক্ত।

## সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা—ইহার প্রতিক্রিয়া

সমাজতন্ত্র পুঁজিবাদের প্রতিক্রিয়া (Reaction)। কিন্তু ইহাতেও মানুষকে উপযুক্ত মর্যাদা দেওয়া হয় নাই। সমাজতান্ত্রিকরা ব্যক্তির পরিবর্তে রাজ্যের নিকট পুঁজি হস্তান্তরিত করিয়াছে কিন্তু রাজ্য অধিকতর অমানবীয় এবং যান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান মাত্র। রাজ্যের সকল কর্ম শুধু প্রাণহীন আইন কানুন মানিয়া চলে। ব্যক্তির যে বিবেচনা থাকে রাজ্যের তাহা থাকে না। যদি সামান্য ব্যতিক্রম ঘটে তবে তাহা দুর্নীতি ও আত্মীয় পোষণের কারণ হয়। পুঁজিবাদী সমাজ শুধু আর্থিক মানুষের কথা চিন্তা করিয়াছে এবং তাহার অন্যান্য স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে। সমাজতন্ত্র 'কল্পিত মানুষের' (Abstract Man) ধারণার বশবর্তী হইয়া আরও অধিক অগ্রসর হইয়াছে। বিভিন্ন রুচি ও ব্যক্তিত্বের সেখানে বিকাশের সুযোগ নাই। মানুষের চাহিদা ও প্রয়োজন সম্পর্কে কয়েদখানার ম্যানুয়াল বা নির্দেশে যতটুকু গুরুত্ব আরোপ করা হয়, সমাজতান্ত্রিক রাজ্যে শুধু ততটুকু গুরুত্ব আরোপ করা হয়। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার ব্যক্তি স্বাধীনতার কোনও স্থান নাই।

## ব্যক্তির উপর রাজ্যের দাবি

সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা ব্যক্তির কোনও সম্পত্তি না থাকায় ব্যক্তিগত সম্পদের কুফল সেখানে নাই। কিন্তু ব্যক্তিগত সঞ্চয়ের জন্য অধিক উৎপাদনের যে আগ্রহ এবং সঞ্চয়ের চেষ্টা তাহাও সেখানে থাকে না। রাজ্যকে সর্বশক্তির অধিকারী করা হয় এবং সকল বিষয়েই তার নির্দেশ

চরম। সেখানে ব্যক্তির লক্ষ্য পূরণের কোনও ব্যবস্থা নাই। যুগোশ্লাভিয়ার খ্যাতনামা কমিউনিষ্ট লেখক মেলভিন জিলাসের ভাষায় "The Class of old fashioned exploiters has been eliminated but a new class bureaucratic (?) exploiters has come into existence"—'অর্থাৎ এখানে পুরাতন ধরনের শোষকদের অবসান ঘটিলেও শাসকবর্গের এক নূতন শোষক গোষ্ঠীর সৃষ্টি হইয়াছে।' কার্ল মার্কস তাঁহার ঐতিহাসিক বিশ্লেষণে বলেন যে পুঁজিবাদীদের নিজেদের মধ্যেই ধ্বংস বীজ নিহিত আছে এবং পুঁজিবাদের পর কমুনিজম উপরিহার্য। ইহাতে কমিউনিষ্ট কর্মীদের অনুপ্রাণিত করা হয় সত্য—কিন্তু এই ধরনের গোঁড়ামি বা উগ্র মতবাদ মানুষের প্রেরণাহীন ও কর্মশক্তি নষ্ট করে। এ অবস্থায় সে আর নূতন ব্যবস্থার স্রষ্টা থাকে না—সে তখন একটি পূর্বনির্দিষ্ট ঐতিহাসিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার যন্ত্রে পরিণত হয়। সুতরাং সে তখন শ্রমিক সংগঠন গড়িলেও শ্রমিকদের ভালমন্দ সম্পর্কে উদাসীন এবং তাহাদের শুধু বিপ্লবের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করে। মার্কসের দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের আদর্শ ও পুঁজিবাদী ব্যবস্থার ধ্বংস করিয়া রাষ্ট্রের প্রাধান্য স্থাপন পর্যন্ত সীমাবদ্ধ। তাহার পরে কি সমাজের বিবর্তন ধারা রুদ্ধ হইয়া যাইবে? প্রতিবিপ্লবীদের ধ্বংস করার নামে রাষ্ট্র তখন অধিক হইতে অধিকতর ক্ষমতার অধীশ্বর হয়। মার্কসীয় মতে দ্বান্দ্বিকনীতি বিকাশের ধারাকে রুদ্ধ করা প্রতিক্রিয়াশীলতা। সুতরাং মার্কস এখানে নিজের নীতিরই বিরোধিতা বা অসারত্ব প্রমাণ করিয়াছেন।

পুঁজিবাদী ও সমাজতান্ত্রিক কোনও ব্যবস্থাই মানুষের একাত্মতা বা পূর্ণরূপ প্রত্যক্ষ করে নাই এবং তাহার আশা আকাঙ্ক্ষা ও ব্যক্তিত্বের মর্যাদা দেয় নাই। একদল তাহাকে অর্থলিপ্সু স্বার্থপর হিসাবে চিন্তা করে এবং অপর দল তাহাকে প্রাণহীন যন্ত্রমাত্র মনে করে। পুঁজিবাদী ব্যবস্থা 'Survival of the fittest' বা অরণ্যের নীতি মানুষকে যেমন প্রতিযোগিতার যন্ত্ররূপে বিচার করিয়াছে, সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা তাহাকে বিরাট অংশ এবং কড়াকড়ি বিধিনিষেধ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত রাজ্যের নির্দেশ ব্যতীত কোনও কিছু করিতে অক্ষম এক অসহায় জীবে পরিণত করিয়াছে। উভয় ব্যবস্থাই অর্থ প্রতিপত্তি ও রাজনৈতিক ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করিয়া মানুষকে মনুষ্যত্বহীন করিতে উদ্যত বা সক্ষম হইয়াছে। ঈশ্বরের সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষ আজ তাহার নিজস্ব স্বকীয়তা হারাইতে বসিয়াছে। আমাদের ইহা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। আমরা পুঁজিবাদ বা সমাজতন্ত্র কোনওটাই মানুষের উপযোগী বলিয়া বিশ্বাস করি না। মানুষের সুখ ও সমৃদ্ধিই আমাদের লক্ষ্য। উভয় ব্যবস্থাতেই মানুষকে লইয়া জুয়াখেলা হইতেছে। এই ব্যবস্থার প্রতিকারের জন্য আমাদের কর্তব্য—(আমাদের সদর্থক ব্যবস্থা)

১। প্রত্যেকটি ব্যক্তিকে তাহার ন্যূনতম প্রয়োজন পূরণের পূর্ণ আশ্বাস প্রদান করা।

২। যাহাতে ব্যক্তি সমাজ ও বিশ্ব আদর্শ বিকশিত হয় তার জন্য ন্যায়নীতি অনুযায়ী এই ন্যূনতম প্রয়োজনের অধিক সম্পদের উৎপাদন ও বন্টন।

৩। প্রতি সক্ষম ব্যক্তির কর্মের সংস্থান এবং যাহাতে অসংযমী আচরণ দ্বারা প্রাকৃতিক সম্পদ নষ্ট না হয় তাহার ব্যবস্থা।

৪। ভারতের অবস্থা অনুযায়ী যন্ত্রের উদ্ভাবন এবং সকল প্রকার বিষয়ে (Seven M) বিবেচনা পূর্বক তাহার প্রয়োগ।

৫। যাহাতে মানুষ উপেক্ষিত না হয় এবং সাংস্কৃতিক ও জীবন মুল্যের পূর্ণ বিকাশ ঘটে তেমন ব্যবস্থার প্রবর্তন।

৬। মালিকানা সংক্রান্ত (রাষ্ট্র, ব্যক্তিগত বা অন্যরূপ) সকল শিল্প বিষয়ে বাস্তব অবস্থা ও উপযোগিতা অনুযায়ী বিবেচনা।

এই জন্য স্বদেশী বস্তু ব্যবহারের আদর্শ ও আর্থিক বিকেন্দ্রীকরণের নীতি আমাদের নিকট অধিক সমাদৃত। গত বহু বৎসর যাবৎ কেন্দ্রীয়করণ এবং একচেটিয়া অধিকার প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চলিয়া আসিয়াছে। ইহার পরিণতি স্বরূপ সমাজ ও বিশ্বের সঙ্কট দেখা দিয়াছে।

আমরা শুধু দার্শনিক তথ্যের আলোচনা করিয়াছি। কিন্তু জনসঙ্ঘের কর্মীরা শুধু দার্শনিক বা নিষ্ক্রিয় দর্শক নহেন। আমরা আমাদের জাতিকে শক্তিশালী, সুখী ও সমৃদ্ধ করিবার সঙ্কল্প গ্রহণ করিয়াছি। সুতরাং আমাদের জাতীয় পুনরুত্থানের জন্য সক্রিয় হইতে হইবে। আমরা শুধু প্রত্নতাত্ত্বিক যাদুঘরে তত্ত্বাবধায়ক হইতে চাহি না।

আমাদের লক্ষ্য শুধু সংস্কৃতির রক্ষা নহে, ইহাকে বর্তমান যুগোপযোগী নবরূপে রূপায়ণ। আমাদের সুস্থ ও প্রগতিশীল জীবনযাপন করিতে হইবে। আমাদের বহু অনুপযুক্ত প্রাচীন প্রথার অবসান ও সত্যের ভিত্তিতে জাতীয় ঐক্য ও অনুভূতির বিকাশ ঘটাইতে হইবে।

'চিতি' বা 'চৈতন্য' জাতীয় আত্ম—যাহা জাতিকে শক্তি যোগায় ও সক্রিয় করে তাহার নাম 'বিরাট'। মানুষের জীবনে প্রাণের যে কাজ, জাতির জীবনে 'বিরাটের' সেই কাজ। যেভাবে প্রাণ শরীরের বিভিন্ন অঙ্গকে সক্রিয় রাখে এবং দেহ ও আত্মার সমন্বয় সাধন করে সেইমত বিরাটই শুধু জাতির কল্যাণ, গণতন্ত্র ও সরকারকে উজ্জীবিত রাখে। জাতির জীবনে বিভিন্ন বৈচিত্র্য তাহার ঐক্যের পরিপন্থী হয় না। ভাষা, পেশা ইত্যাদির পার্থক্য সর্বত্র আছে কিন্তু যখন এই বিরাট জাগ্রত হয় তখন বৈচিত্র্য সংঘর্ষের পরিবর্তে সহযোগিতার দ্বারা পরম্পরাকে শক্তিশালী করিয়া তোলে এবং জাতির মহান আদর্শের প্রতিষ্ঠা হয়।

আমাদের এই আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইয়া দুস্তর পথ অতিক্রম করিতে হইবে। নর'কে নারায়ণে পরিণত করাই আমাদের দেশের আদর্শ এবং ঈশ্বর আমাদের মহান ব্রতের সার্থকতার জন্য শক্তি দিন।

।। ভারতমাতা কী জয়।।



Pt. Deendayal Upadhyaya with leaders of the Jana Sangh.